Contents

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১১তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে ২০০৮

মাসিক
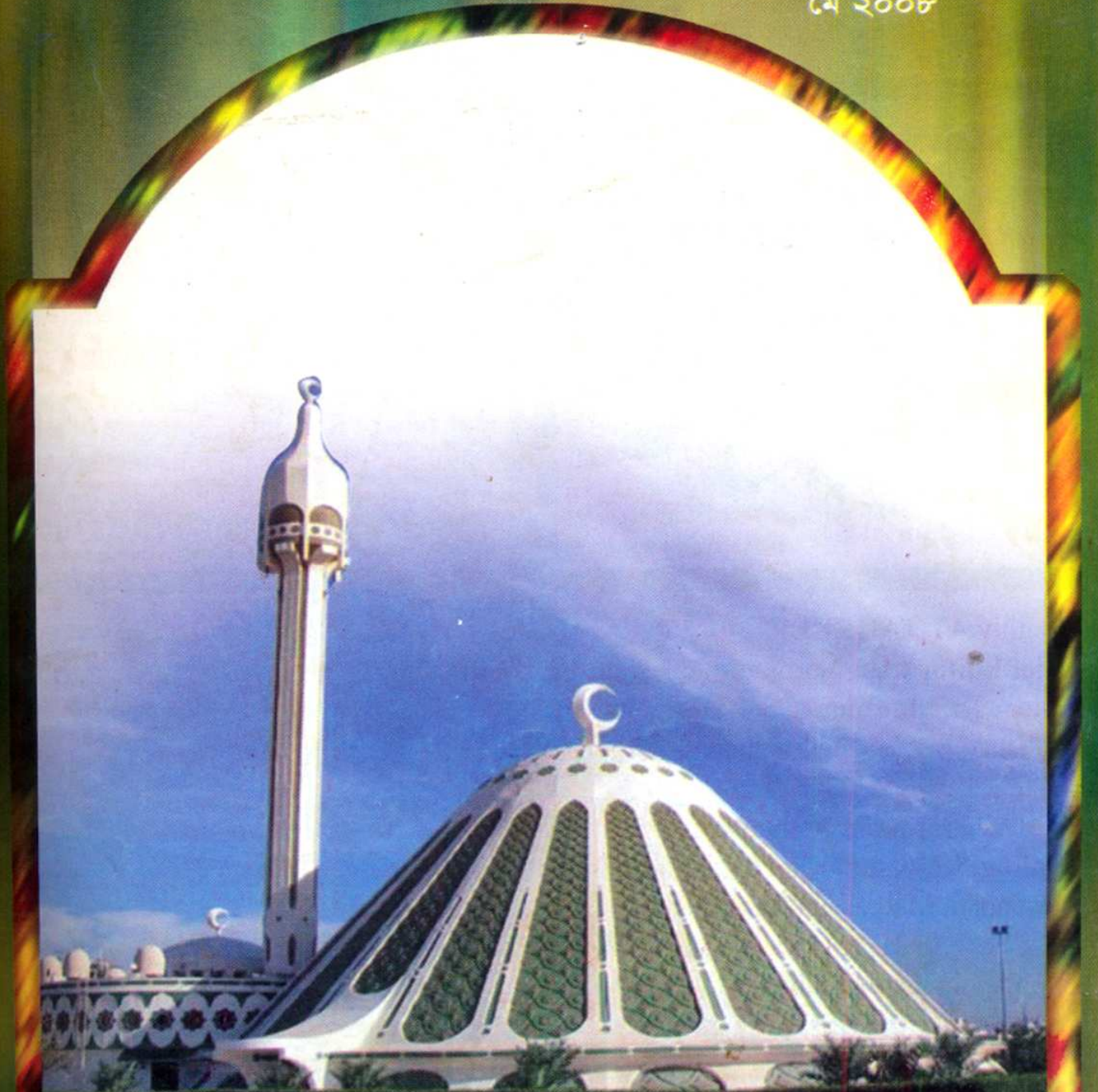
আত-তাহরীক

১১তম বর্ষ মে ২০০৮ ইং ৮ম সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ সম্পাদকীয় ০২

✡ প্রবন্ধঃ

❑ মুসলিম ব্যক্তিকে কাফের বলার শর্তাবলী এবং খারেজী মতবাদ ০৩
-আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম

❑ নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রথাঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী ০৮
- মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন

❑ ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার ও পাশ্চাত্যে নারী স্বাধীনতার চালচিত্র *- নূরুল ইসলাম* ১৩

❑ প্রতারণা *- রফীক আহমাদ* ১৭

❑ ইসলাম এবং মুসলমানদের উপর স্লো পয়জনিং ২১
- মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

❑ 'জঙ্গি তৈরীর কারখানা' থেকে ফিরে ২৫
- সঞ্জীব চৌধুরী

✡ অর্থনীতির পাতাঃ ২৭

♦ সূদের অভিশাপঃ পরিত্রাণের উপায়
- শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

✡ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ ৩৪

♦ কপাল গাড়ীর চাকা *-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*

✡ চিকিৎসা জগতঃ ৩৫

♦ ক্যান্সারবিরোধী খাদ্য ♦ তুঁতপাতা ডায়াবেটিস কমায়

✡ ক্ষেত-খামারঃ ৩৬

♦ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন

✡ কবিতাঃ ৩৭

♦ মুমিন বলি তাকে ♦ তীব্র প্রতিবাদ ♦ নগ্নতার সুর

✡ সোনামণিদের পাতা ৩৮

✡ স্বদেশ-বিদেশ ৩৯

✡ মুসলিম জাহান ৪৩

✡ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৪

✡ পাঠকের মতামত ৪৫

✡ সংগঠন সংবাদ ৪৭

✡ প্রশ্নোত্তর ৪৯

সম্পাদকীয়

দেশে বিরাজমান খাদ্য সংকট ও কতিপয় সুপারিশ

ভয়াবহ খাদ্য সংকটে বিপর্যস্ত দেশ। বিপন্ন দেশের মানবতা। অনাহারে-অর্ধাহারে জীবন্মৃত হয়ে কোন রকমে বেঁচে আছে দেশের হতদরিদ্র বিশাল জনগোষ্ঠী। কেউবা আবার ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে জীবনপ্রদীপ সাঙ্গ করে চিরবিদায় নিয়েছে। কেউ অভাবের তাড়নায় নিজ সন্তানদের গর্ত করে জীবন্ত প্রোথিত করার জাহেলী দৃষ্টান্ত স্থাপনেও উদ্যত হয়েছে। কেউ আবার চরম নিষ্ঠুরতার সাথে নিজ অবুঝ সন্তানদের গামছাবন্দী করে পুকুরের অথৈ পানিতে নিক্ষেপ করে নিজেও বিষ পানে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এরকম অসংখ্য হৃদয়বিদারক ঘটনা সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অভাবী ও অনাহারী মানুষের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। যার ছিটে-ফোঁটা পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হ'লেও অধিকাংশ ঘটনাই হয়তবা অজানা রয়ে গেছে। উল্লেখ্য যে, বিগত বছরে পরপর দু'বারের প্রলয়ংকরী বন্যা ও দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপর ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'-এর তীব্র আঘাতে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির কারণে দেশে খাদ্য ঘাটতির সম্ভাবনা তখনই দেখা দেয়। কিন্তু সরকারের অদূরদর্শিতার কারণে এবং সময়মত পদক্ষেপ গ্রহণের অভাবে খাদ্য ঘাটতি ক্রমান্বয়ে নীরব দুর্ভিক্ষে রূপ নেয়। বাজারে দ্রব্যমূল্য লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। ২০ টাকা কেজির চাউল কিনতে হয় প্রায় ৪০ টাকায়। সেই সাথে ভোজ্য তেল, ডাল সহ অন্যান্য সকল পণ্যের মূল্যই প্রতিযোগিতামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়। সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায় সবকিছু। উল্লিখিত সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে প্রায় তিন গুণ। একশ্রেণীর মজুদদার ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশ আরও নাজুক করে তুলে। বেকার ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে থাকে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পরিসংখ্যান মতে- বাংলাদেশে বেকার জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৪ কোটি। গত দেড় বছরে আরো ১ কোটি লোক বেকার হয়েছে। ৫০ হাযার শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে। গত এক বছরে নতুন করে শতকরা ২০ ভাগ লোক দরিদ্রের কাতারে যোগ দিয়েছে। দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০ কোটিতে। এদের মধ্যে ৪ কোটি লোক বর্তমানে ৩ বেলা খাবার পায় না।

প্রশ্ন হল কেন আমাদের এ বেহাল দশা? শায়েস্তা খাঁর আমলে যেখানে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত, এ অঞ্চলের প্রাচুর্যের টানে যেখানে মোগল, পাঠান, বৃটিশ, ফরাসী, পর্তুগীজরা ছুটে এসেছিল, যাকে 'প্রাচুর্যের উপচেপড়া নহর' বলে আখ্যায়িত করা হ'ত, সেই ধানের দেশ-ফসলের দেশের মানুষ আজ না খেয়ে মরছে, এক মুঠো অন্নের জন্য জীবন সাঙ্গ করে দিচ্ছে, কেন? এই কেন-র জবাবে মহান আল্লাহ তা'আলার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হচ্ছে- 'জলে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের কৃতকর্মের জন্য' *(রূম ৪১)*। অর্থাৎ মানুষের অন্যায় কর্মের দরুন নানা রকমের বিপর্যয়, অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি নেমে আসে। বাংলাদেশের বর্তমান খাদ্য ঘাটতির ক্ষেত্রেও যার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আমাদের অন্যায় কর্মের কারণে যেমন মাঝে মধ্যে আসমানী গযবে আমাদের ক্ষেতের ফসল বিনষ্ট হচ্ছে, তেমনি

Contents

একশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ মুনাফাখোর অসাধু ব্যবসায়ীর কারণে বাজারে এ বেহাল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যারা অধিক মুনাফার আশায় পণ্য বাজারে সরবরাহ না করে বরং মজুদ করে থাকে। আর এতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হ'লে ঐ সিণ্ডিকেট অধিক মূল্যে পণ্য সরবরাহ করে। অথচ ইসলাম মজুদদারীকে চূড়ান্তভাবে নিরুৎসাহিত করেছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে পণ্য মজুদ করে সে পাপী' *(মুসলিম)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি খাদ্য মজুদ করে রাখে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার উপর লা'নত করেন' *(তাবারাণী)*।

এক্ষণে আমরা দেশের বর্তমান নীরব দুর্ভিক্ষের জন্য নিম্নোক্ত কারণগুলিকে চিহ্নিত করে এর প্রতিবিধানের জন্য সরকারের নিকট জোর সুপারিশ করছি।

(ক) বাজার নিয়ন্ত্রণঃ সরকারের বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা এই সংকটের অন্যতম কারণ। সরকারকে কঠোর হস্তে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কোন মজুদদার বা অসাধু ব্যবসায়ী যেন দেশে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে মণিটরিং সেল গঠন করে বাজার তদারকি করতে হবে।

(খ) পণ্যের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণঃ আমাদের দেশে প্রায়শই দেখা যায় যে, কোন পণ্যের সংকটের সম্ভাবনা দেখা দিলে আর তা পত্র-পত্রিকায় বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রচারিত হ'লে সংকট শুরু হওয়ার বহু আগে থেকে ব্যবসায়ীরা নিজেরা স্বেচ্ছাচারিতার সাথে উক্ত পণ্যের যথেচ্ছা মূল্য বৃদ্ধি করে থাকে। এতে ভোক্তা সাধারণ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করতঃ ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করলে এই অবস্থার সৃষ্টি হবে না। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে সরকার ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিবে।

(গ) কৃষি সহায়তা বৃদ্ধিকরণঃ বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের অর্থনীতিও কৃষি নির্ভর। কাজেই কৃষিকে অবহেলা করার কোন সুযোগ এখানে নেই। বিনা সূদে কৃষককে ঋণ প্রদান এবং কৃষি খাতে যথেষ্ট পরিমাণে ভর্তুকির ব্যবস্থা করা এখন সময়ের অনিবার্য দাবী। মনে রাখতে হবে কৃষিতে সরকারী বিনিয়োগের বিরোধিতাকারী 'বিশ্বব্যাংক' ও 'আইএমএফ'-এর প্রেসক্রিপশন এদেশের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না। এরা হচ্ছে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার। এরা ঋণ দেয় আর সেই সুযোগে চাপ প্রয়োগ করে আন্তর্জাতিক মহাজনের ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য যে, দেশের অভ্যন্তর থেকে প্রতি বছর ৩ কোটি মেট্রিক টন চাল উৎপাদন হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, যে কৃষক এই বিশাল পরিমাণ খাদ্যের যোগান দেয়, সে কৃষককে পড়তে হয় নানা সংকটে। সার, বীজ, কীটনাশক, সেচ সহ বিভিন্নমুখী সংকটে প্রতিনিয়ত ব্যাহত হয় কৃষিকাজ। এসব সেক্টরে সরকারকে অবশ্যই যত্নবান হ'তে হবে। উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কৃষি সহায়তা বাড়াতে হবে। নচেৎ খাদ্য ঘাটতি ক্রমশ বাড়তেই থাকবে।

(ঘ) চাষের জমি বৃদ্ধি বা সংরক্ষণঃ আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত চাষের জমি হ্রাস পাচ্ছে। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, প্রতিদিন ২৩৫ হেক্টর কৃষি জমি ধ্বংস হচ্ছে। গত ২৫ বছরে ৬০ লাখ একর জমি চাষের বাইরে চলে গেছে। অতএব পরিকল্পিত বাসস্থান ব্যবস্থা করে চাষের জমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া দেশের পরিত্যাক্ত সকল খাস জমিকেও চাষাবাদের আওতায় আনতে হবে।

(ঙ) সরকারী মজুদ বৃদ্ধিকরণঃ সরকারের খাদ্য মজুদ বাড়াতে হবে। আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে চাহিদার ষোলআনা সংগ্রহ সম্ভব না হ'লে প্রয়োজনে অগ্রিম আমদানীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ পূর্ণাঙ্গ করতে হবে। অন্যথায় সংকট উপস্থিত হওয়ার পর উদ্যোগ নিলে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হ'লে লাখো লাখো অসহায় মানুষ হয়ত দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে।

(চ) কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ নয়, বরং নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু করার মাধ্যমে দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। **(ছ)** দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনার মাধ্যমে বিদেশী ঋণের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে। **(জ)** দেশের সর্বত্র রেশনিং পদ্ধতি চালু করতে হবে। **(ঝ)** খাদ্যের অপচয় রোধ করতে হবে। অনেক সময় হাযার হাযার টন গোদামজাত খাদ্যদ্রব্য পচে নষ্ট হ'তে দেখা যায়। এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **(ঞ) সর্বোপরি দেশে সুশাসন ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে**। মনে রাখতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই এই ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রূযীদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা। তাঁর বিধানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে যেকোন সময় আসমানী গযবের শিকার হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

পরিশেষে বলব, যে দেশে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার মুখ থুবড়ে পড়ে সে দেশে কল্যাণ আশা করা যায় না। যে দেশে নিরপরাধ আলেমদের উপর নির্যাতন চলে সে দেশে রহমতের দ্বার রুদ্ধ হওয়া বিচিত্র নয়। অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি সে জাতিকে গ্রাস করবে এটিই স্বাভাবিক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**কে বিনা অপরাধে দীর্ঘ তিন বছর দুই মাস যাবৎ কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে। বিগত জোট সরকার ডজন খানেক মিথ্যা মামলা দিয়ে তাঁর মত একজন বিশ্ববরেণ্য আলেমকে কারারুদ্ধ করেছে। তিনি মযলূম অবস্থায় কারাগারে আর্তনাদ করছেন। হাদীছে আছে 'মযলূমের দো'আ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে কোন পর্দা থাকে না'। তার হৃদয় উৎসারিত আকুতি দেশের সরকারের নিকটে না পৌঁছলেও তা নিঃসন্দেহে মহান ক্ষমতাশীল বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌র নিকটে পৌঁছেছে। অতএব আল্লাহ্‌র রোষানল থেকে এই দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে ইনছাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করুন। প্রফেসর ডঃ গালিবকে অবিলম্বে মুক্তি দিয়ে কৃত ভুলের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তাঁর মত আরো যারা বিনা অপরাধে কারানির্যাতন ভুগ করছেন তাদের সকলকে মুক্তি দিন। দেশের কল্যাণ চিন্তায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিবিষ্ট মনে কাজ করুন! কারো উপরে যুলম চাপিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন, আমাদের এই ছোট্ট স্বাধীন মুসলিম দেশটিকে হেফাযত করুন, আমাদের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভরতা দান করুন- আমীন!!

Contents

মুসলিম ব্যক্তিকে কাফের বলার শর্তাবলী এবং খারেজী মতবাদ

*আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম**

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দেওয়ার শর্তাবলীঃ

সঊদী আরবের স্বনামধন্য মুফতী শায়খ ছালেহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান বলেন,

والتكفير له ضوابط شرعية، فمن ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام التى ذكرها أهل السنة والجماعة حكم بكفره بعد إقامة الحجة عليه، ومن لم يرتكب شيئًا من هذه النواقض فليس بكافر وإن ارتكب بعض الكبائر التى هى دون الشرك.

'কাউকে কাফের বলা সম্পর্কে শরী'আতে মূলনীতি রয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কর্তৃক উল্লিখিত ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয় সমূহের কোন একটি করে বসবে তাকে কাফের বলে ফায়ছালা দেয়া হবে, তার প্রতি দলীল কায়েম করার পর (অর্থাৎ দলীল দিয়ে তাকে বুঝানোর পর তাকে কাফের বলা যাবে। এর পূর্বে তাকে কাফের বলা যাবে না)। আর যে ব্যক্তি এই সব ইসলাম ভঙ্গকারী বস্তু হ'তে কোন কিছু সম্পাদন করবে না সে কাফেরও হবে না, যদিও সে শিরকের নিম্নস্তরের কবীরা গুনাহ করে বসে'।[২২]

এ বিষয়ে যুগশ্রেষ্ঠ ফক্বীহ আল্লামা ইবনু উছায়মীনের বাণী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, কাফের বলার ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। **প্রথম বিষয়ঃ** সংশ্লিষ্ট বিষয়টি যে কুফরী, সে সম্পর্কে দলীল থাকতে হবে। **দ্বিতীয় বিষয়ঃ** উক্ত কুফরী কাজ সম্পাদনকারীর ক্ষেত্রে কুফরী ফৎওয়া আরোপ করার বিষয়টি তাহক্বীক্ব করতে হবে। আমাদের কারো নিকট মহান আল্লাহ্‌র নিম্নের এই বাণীটি গোপন নেই- 'যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি' *(নাহল ১০৬)*। অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ জবরদস্তকৃত ব্যক্তি থেকে কুফরীর বিধান উঠিয়ে নিয়েছেন, যদিও সে তা যবান দ্বারাও উচ্চারণ করে।

অনুরূপভাবে নবী করীম (ছাঃ) এই মর্মে খবর দিয়েছেন যে, মহান প্রতিপালক স্বীয় বান্দার তওবায় ঐ ব্যক্তির চেয়েও আনন্দিত হন, যে ব্যক্তি নিজ বাহন হারিয়ে ফেলে, যার উপর তার পানাহার ছিল। তাই নিরাশ হয়ে বৃক্ষের নীচে শুয়ে পড়ে। এমতাবস্তায় হঠাৎ সে দেখতে পায় যে, তার (বাহন) উষ্ট্রীটি উপস্থিত হয়েছে। সে উষ্ট্রীটির লাগাম ধারণ পূর্বক বলে, হে আল্লাহ! আপনি আমার বান্দাহ, আর আমি আপনার প্রতিপালক! নবী করীম (ছাঃ) বলেন, লোকটি খুশীতে আহলাদিত হয়ে ঐভাবে ভুল করেছিল।[২৩] অথচ সে কারণে সে কাফেরে পরিণত হয়নি। যদিও তার উচ্চারিত বাক্যটি প্রকাশ্য কুফরী বাক্যই ছিল।

অনুরূপভাবে ঐ ব্যক্তির প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য... যে বলেছিল, আল্লাহ যদি আমাকে ধরতে সমর্থ হন তবে আমাকে তিনি এমন শাস্তি দিবেন যা বিশ্ববাসীর কাউকেও দিবেন না। তাই সে তার পরিবারকে এই মর্মে নির্দেশ করেছিল যেন তার মৃত্যুর পরে তারা তাকে পুড়িয়ে ছাই করে তা সাগরে ছিটিয়ে দেয়, (তারা তাই করেছিল)। মহান আল্লাহ তাকে জমা করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, (কেন তুমি এমনটি করেছিলে)? তদুত্তরে সে বলেছিল, হে প্রতিপালক! আপনার ভয়ে করেছিলাম (ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন)।[২৪] এই লোকটিও কাফের হয়নি...।[২৫]

উক্ত লোকটির কুফরী স্পষ্ট অথচ সে কাফের হয়নি। কারণ পুড়িয়ে ছাই করা হ'লে আল্লাহ পাকড়াও করতে পারবেন না এরূপ বিশ্বাস নিঃসন্দেহে কুফরী। কিন্তু যেহেতু লোকটি মূর্খ ছিল এবং মূলে সে আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাসীই ছিল, কাজেই মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) সম্মানের নিমিত্তে নবী করীম (ছাঃ)-কে সিজদা করেছিলেন। তার এই কাজটি যদিও স্পষ্ট কুফরী ছিল কিন্তু সেজন্য তিনি কাফের হননি, কারণ তিনি বুঝতে ভুল করেছিলেন। হাদীছটি নিম্নরূপ-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلاَ تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِىَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ.

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; দাঈ, ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, আল-জাহ্‌রা শাখা, কুয়েত।*

২২. *দ্রঃ মুরাজা'আত ফী ফিকুহিল ওয়াক্বি আস-সিয়াসী ওয়াল-ফিকরী, পৃঃ ৪৯; ছিলাতিল গুলূ ফীত তাকফীর বিল জারীমাহ, পৃঃ ৭৯।*

২৩. *ছহীহ মুসলিম হা/২৭৪৭।*

২৪. *ছহীহ বুখারী, 'তাওহীদ' অধ্যায় হা/৬৯৫২; ছহীহ মুসলিম হা/৪৯৪৯ 'তাওবাহ' অধ্যায়।*

২৫. *ছিলাতুল গুলূ ফিত তাকফীর বিল জারীমাহ, পৃঃ ২২৩-২২৪।*

আব্দুল্লাহ ইবনু আবু আওফা হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আয (রাঃ) সিরিয়া থেকে ফিরে এসে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে সিজদাহ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে মু'আয! এ কী (করছ)? তিনি বললেন, আমি সিরিয়ায় গমন করে দেখলাম, তারা (খৃষ্টানরা) তাদের নেতা ও ধর্মীয় পণ্ডিতদেরকে সিজদা করছে। তাই আমি মনে মনে এটা পসন্দ করে রেখেছিলাম যে, আমরাও আপনার সাথে অনুরূপ করব। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা এমনটি কর না। কারণ আমি যদি কাউকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে অবশ্যই নারীকে স্বীয় স্বামীকে সিজদা করার নির্দেশ করতাম। ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! কোন নারী আল্লাহ্র হক্ব আদায় করতে পারবে না, যতক্ষণ সে নিজ স্বামীর হক্ব আদায় না করবে। যদি সে তাকে উটের হাওদাজে উপবিষ্ট থাকাবস্থায়ও উপভোগ করতে চায় তবুও সে তাকে বাধা দিবে না'।[২৬]

ছাহাবী হাত্বেব বিন আবী বালতা'আহ নবী করীম (ছাঃ)-এর মক্কা বিজয় করার দৃঢ় সংকল্পের কথা মক্কার কাফেরদেরকে জানানোর জন্য চিঠি লিখে জনৈকা মহিলার হাতে পাঠিয়েছিলেন। অথচ নবী করীম (ছাঃ) মক্কার কাফেরদের নিকট তা প্রকাশ করতে সকল ছাহাবীকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু এরপরেও উক্ত ছাহাবী কাফেরদেরকে নবীর যুদ্ধের পরিকল্পনার কথা জানাতে উদ্যত হয়েছিলেন। অহী মারফত নবী করীম (ছাঃ) তা জানতে পারলে তিনি লোক পাঠিয়ে রাওযায়ে খাক নামক স্থান থেকে উক্ত মহিলার নিকট হ'তে পত্রটি উদ্ধার করেন। হাত্বেব বিন আবী বালতা'আহকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার এমন কোন উদ্দেশ্য নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর অবিশ্বাসী হই। তবে আমি চেয়েছিলাম যাতে করে (মক্কার) ঐসব লোকরা আমার হাতে থাকে এবং তাদের থেকে আমার পরিবার ও সম্পদ রক্ষিত হয়। আর আপনার এমন কোন ছাহাবী সেখানে নেই যার দ্বারা আল্লাহ তার পরিবার ও সম্পদ রক্ষা করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে সত্য বলেছে। তোমরা তাকে ভাল কথা বৈ অন্য কিছু বলবে না...'।[২৭]

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, ছাহাবী হাত্বেব ইবনু আবু বালতা'আহ যে কাজটি করেছিলেন, তা নিশ্চিতভাবে কুফরী কাজ ছিল। কারণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে অমুসলিমদের সাহায্য করা কুফরী যা ইসলাম ধ্বংসের অন্যতম কারণ। কিন্তু এরপরেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে কাফির-মুরতাদ আখ্যা দেননি। বরং তার নিকট থেকে উক্ত কুফরী কর্মের প্রকৃত কারণ জানার পর তাকে সত্যবাদী জেনে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং সকলকে তার সম্পর্কে মন্দ বলতেও নিষেধ করেছেন। এ থেকে দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয় যে, মুসলিম ব্যক্তি দ্বারা কোন সময় অনিচ্ছায় কুফরী কর্ম হয়ে গেলেও তাকে হুট করে কাফের বলা যাবে না। বরং তার সম্পর্কে ভাল করে জানতে হবে। কিন্তু যারা উগ্রবাদী খারেজী তারা পাইকারীভাবেই পাপী মুসলিমদেরকে কাফির ফৎওয়া দিয়ে থাকে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারীদের ও বিদ'আতী খারেজীদের মাঝে এখানেই পার্থক্য।

শরী'আতের কোন কিছুকে ঠাট্টা করলে সে প্রকৃত কাফের বলেই বিবেচিত হবে। কারণ এটা সে আন্তরিকভাবে স্বেচ্ছায় করে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ لاَتَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ.

'আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন তাহ'লে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম মাত্র। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্র সাথে, তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা কর না, ঈমান প্রকাশ করার পর তোমরা কাফের হয়ে গেছ' *(তওবাহ ৬৫-৬৬)*।

কোন কোন আলেম ইসলাম বিধ্বংসী বিষয়গুলোতে জড়িয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে ঢালাওভাবে কাফির বলে থাকেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও তাদেরকে কাফির বলার বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

চরমপন্থী মতবাদে প্রভাবিত নওজোয়ানদের প্রতি আমাদের আহ্বানঃ

হে নওজোয়ান ভাইয়েরা! ঐসব নাশকতামূলক কাজ-কর্ম থেকে ফিরে আসার এখনও সময় আছে। ঐ পথে হেঁটে ইহ-পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়া অন্য কিছু নেই। কারণ এই পথ হ'ল চরমপন্থী খারেজীদের পথ, এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পথ নয়। ছাহাবী-তাবেঈদের থেকে কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা কেউ বেশী বুঝে না, ক্বিয়ামত পর্যন্ত কেউ বেশী বুঝবেও না। কিন্তু চরমপন্থী খারেজীরা তাদের চেয়েও কুরআন-হাদীছ বেশী বুঝার দাবী করেছিল। শুধু তাই নয়, তাঁদের অনেককে তারা কাফির বলে আখ্যায়িত করেছিল। তাঁদের খুন হালাল ভেবে তাদেরকে হত্যা করেছিল। জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দু'জন প্রখ্যাত ছাহাবী ওছমান ও আলী (রাঃ)-কে কাফির বলে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। তারা ছাহাবীদের কোন তোয়াক্কা করেনি, তাদের গভীর জ্ঞান থেকে উপকৃত হয়নি। আজও যারা 'হুঁশ কম-জোশ বেশী' তারা সেই ছাহাবী ও তাবেঈদের শিক্ষা থেকে উপকৃত হয় না। তারা মনে করে যারা ন্যায়নিষ্ঠভাবে ছাহাবী ও তাবেঈদের অনুসারী তারা কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝে না বা বুঝলেও

২৬. *ছহীহ ইবনু মাজাহ, 'বিবাহ' অধ্যায়, হা/১৮৪৩, হাদীছ ছহীহ।*
২৭. *ছহীহ বুখারী, 'মুরতাদদের থেকে তওবাহ তলব' অধ্যায়, হা/৬৪২৬, 'মাগাযী' অধ্যায়, হা/৩৬৮৪।*

কাপুরুষতাবশত তারা তা প্রচার করছে না। কিংবা তারা রাজা-বাদশাহদের পা চাটা গোলাম বলে চরমপন্থীরা মনে করে!

অথচ শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, অন্যান্য ধর্মের মধ্যকার আলেমরাই ছিলেন সব থেকে নিকৃষ্ট। কিন্তু এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বই হ'লেন হক্কানী ওলামায়ে দ্বীন। ইতিহাস প্রমাণ করে যিনি যত বড় আলেম তিনি ইসলামের তত বেশী খিদমত করেছেন। ইসলামের আসল রূপরেখা তারাই জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। কিন্তু অধুনা যুগের ঐসব চরমপন্থীদের নিকট তারাই যেন সর্বনিকৃষ্ট শ্রেণী। এজন্যই তারা আলেমদেরকে বিভিন্ন নিকৃষ্ট নামে পরিচয় দিয়ে থাকে। তাঁরা নাকি সরকারের গোলাম, দুনিয়াদার আলেম, হক কথা বলতে ভয় পান, কাপুরুষ, কুরআন-হাদীছ নিয়ে পুতুল খেলে ইত্যাদি। তাদের ভাষায় বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিছ নাছিরুদ্দীন আলবানী, বিশ্ববিখ্যাত মুফতী আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, বিশ্বখ্যাত ফক্বীহ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) সকলেই দুনিয়াদার ও পেটপুজারী আলেম, সরকারের গোলাম (নাঊযুবিল্লাহ)। ঐসব চরমপন্থী খারেজীরা উক্ত প্রথিতযশা মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহ ওলামায়ে দ্বীনকে ঐভাবেই স্মরণ করে থাকে এবং তাদের ভক্ত-অনুরক্তদেরকে ঐভাবেই বুঝিয়ে থাকে। যার উজ্জ্বল প্রমাণ রিয়াদের বোমা বিস্ফোরণে গ্রেফতারকৃত আসামী আব্দুল আযীয আল-মি'ছাম এর পূর্বোক্ত যবানবন্দী।[২৮]

আমাদের দেশেও এদের মতবাদ পুষ্টরা তাদের কথায় কোন ভ্রূক্ষেপ করত না, তাদেরকে এরা ইশারা ইঙ্গিতে বলতে চাইত যে, তারা সরকারের তাবেদার, দুনিয়াদার আলেম, কাপুরুষ আলেম প্রভৃতি। যাদের কথা এদের নিকট সর্বোচ্চ প্রাধান্য পেত তারা কুরআন-হাদীছের সঠিক ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে ব্যর্থ এবং বর্তমান যামানার নামকরা খারেজী হিসাবে পরিচিত। অথচ এরা সঊদী আরবের সেই ইলমের পাহাড়, আল্লাহভীরু আলেমে দ্বীন শায়খ ইবনু বায সহ সেদেশের বিজ্ঞ 'ওলামা পরিষদকে' সরকারের কৃতদাস বলতেও কুণ্ঠাবোধ করত না।[২৯] তাদের অনুসারীরাও ঐ সমস্ত প্রখ্যাত সালাফী ওলামায়ে দ্বীনের পরিবর্তে তাদের তথাকথিত নেতাকেই বেশী শ্রদ্ধা করত, বাংলাদেশে তাঁর ওস্তাদ তুল্য বড় বড় সালাফী শায়খ থাকতেও তাকেই তারা বড় শায়খ গণ্য করত; এখনও হয়তো করে থাকে (ওয়াল্লাহু আ'লাম)। অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। বরং ঐ সমস্ত প্রখ্যাত সালাফী ওলামায়ে দ্বীনই হ'লেন হক্কানী আলেম, যাদের নিকট শরী'আতের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রয়েছে। তারা জেনে শুনে সজ্ঞানেই উক্ত খারেজী মতবাদকে পরিত্যাগ করেছেন এবং তার বিরোধিতা করেছেন। তারা অন্য কোন যামানার আলেম নন, বরং বর্তমান যামানারই আলেম। তারা ভাল করেই জানতেন যুগ-যামানার পরিস্থিতি। তাই তারা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের নামে নিরীহ মানুষ হত্যা, নারী-শিশু হত্যা, সরকারী স্থাপনা ধ্বংস সাধন করার ফৎওয়া দেননি! মুসলিম হয়ে অপর মুসলিম ভাইকে কাফের বলেননি, এমনকি মুসলিম শাসকদেরকেও তাদের বিবিধ পাপাচারের জন্য কাফির ফৎওয়া দেননি। তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ, আত্মঘাতী বোমা হামলা পরিচালনা করার কথা বলেননি, বরং সেগুলোকে তারা হারাম বলেছেন এবং এসবই খারেজী অপতৎপরতা বলে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দিয়েছেন।

২৮. *বিস্তারিত দ্রঃ 'ফিৎনাতুত তাকফীর ওয়াল হাকিমিয়্যাহ'।*
২৯. *দেখুনঃ 'ফিৎনাতুত তাকফীর ওয়াল হাকিমিয়্যাহ'।*

অতএব প্রিয় বন্ধুরা! কুরআন ও হাদীছের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা কর। যে বিষয়ে জানা নেই সে বিষয়ে প্রকৃত আলেমদের থেকে জেনে নাও। তবেই সঠিক সমাধান পাবে। ইলম চর্চা কর, ইলমের মাধ্যমেই মূর্খতার অমানিশা বিদূরিত হবে। তোমাদের কি মন চায়না যে, তোমরাও বিশ্ব বিখ্যাত আলেম হয়ে এই উম্মতের কল্যাণ সাধন করবে?

তোমরা জাতিকে কি উপহার দিয়েছ? তোমাদের কারণে তোমাদের নিজ আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত আজ ভীত-সন্ত্রস্ত। লোক সমাজে উপেক্ষিত। যারা উক্ত নাশকতামূলক কাজে জড়িত হওয়ায় গ্রেফতার হয়েছিল, খুব ভাল করেই প্রত্যক্ষ করেছ তাদের শেষ পরিণতি। তাদের কারো কারো নিজ স্ত্রী-পরিবারও অসহায় অবস্থায় কারা বরণ করছে, মা'ছূম বাচ্চা ইয়াতীম হয়েছে, স্ত্রী বিধবা হয়েছে। তাদের পিতা-মাতা তাদের কলিজার টুকরা সন্তানের অকাল বিয়োগ ব্যথায় কান্নায় বুক ভাসাচ্ছে। ছহীহ আক্বীদার দাওয়াত আজ তোমাদের কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তোমাদের সেই সব অশুভ তৎপরতার কারণে আজ **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** মত প্রথিতযশা আলেমে দ্বীন নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তিন বছর যাবৎ কারাবন্দী রয়েছেন। আজ জাতি তাঁর মহান খিদমত থেকে বঞ্চিত। তাঁর স্ত্রী, পরিবার-পরিজন তাঁর শীতল ছায়া থেকে বঞ্চিত। এটাই কি তোমাদের জিহাদ? এভাবেই কি নবী করীম (ছাঃ) মুসলিম হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বলেছেন? না, তোমাদের এই ধারণা সঠিক নয়। তোমাদের ঐসব কর্মকাণ্ড খারেজী মতবাদের সাথে মিল রয়েছে, যে মতবাদ নবী করীম (ছাঃ)-এর আদর্শ থেকে হাযার হাযার মাইল দূরে অবস্থিত। ঐ মতবাদ পৃথিবীর ইতিহাসে কখনই কল্যাণ বয়ে আনেনি; বরং সর্বকালে সর্বযুগে এই জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এই পথ দুনিয়া ও আখেরাত ধ্বংসের পথ, এটা জান্নাতের পথ নয়।

যদি তোমাদের এই পথ কল্যাণকর হ'ত বা জান্নাতের পথ হ'ত তবে এর প্রমাণ শরী'আতে পাওয়া যেত। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে ইযাম, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, বর্তমান যুগের যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ নাছিরুদ্দীন আলবানী, মান্যবর মুফতী ইবনু বায, বিখ্যাত ফক্বীহ ইবনু উছায়মীন (রহঃ) সহ আরব জাহানের বড় বড় সালাফী

ওলামায়ে দ্বীন, বাংলাদেশের প্রবীণ সালাফী ওলামায়ে কেরাম সহ শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে দ্বীন এই পথেই পরিচালিত হ'তেন। মানুষকেও সেদিকে উদাত্ত আহ্বান জানাতেন। কিন্তু তাঁরা তা না করে বরং আরো সেই বন্ধুর পথ থেকে মানুষকে সতর্ক ও সাবধান করেছেন। দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, এই পথ চরমপন্থী খারেজীদের পথ, যাদের অন্যতম পরিচয় হ'ল যে, তারা মূর্তি পূজারীদের ব্যতিরেকে ইসলাম পন্থীদেরকে হত্যা করবে।[৩০]

আর তাদের ঐপথে থেকে মরণটিও হবে বিতর্কিত মরণ। যতই একে জিহাদী বা শহীদী মরণ বলা হোক না কেন আমরা কিন্তু নবীর কথাকেই বিশ্বাস করব। কারণ খারেজীদের মরণের পর ঠিকানা কী হবে তা তিনি বলেই দিয়েছেন।[৩১] আল্লাহ না করুন তোমরা উক্ত হাদীছের আওতাভুক্ত হও। আর আত্মঘাতী মরণ কি জঘন্য পাপ তা আশা করি কারো অজানা নেই; আর একথাও অজানা নেই যে, তার একমাত্র ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। কাজেই এই ভুল কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। উক্ত মর্মে কতিপয় হাদীছ এখানে উল্লেখ করা হ'লঃ

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللهُ يَدَرَنِى عَبْدِى بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

(১) জুন্দুব বিন আব্দুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, একজন ব্যক্তি জখম হ'লে, সে (অধৈর্য হয়ে) আত্মহত্যা করে। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ বললেন, 'আমার বান্দাহ আমার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের জীবনের ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিলাম'।[৩২]

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ.

(২) ছাবিত বিন যাহ্হাক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন লৌহ অস্ত্রাঘাতে আত্মহত্যা করবে, তাকে সে লৌহ অস্ত্র দিয়েই জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে'।[৩৩] অর্থাৎ যেভাবে লৌহ অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল, ঠিক সেভাবে সে জাহান্নামে আত্মহত্যা করতে থাকবে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّذِى يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِى النَّارِ وَالَّذِى يَطْعَنُهَا يَطْعَنُهَا فِى النَّارِ.

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শ্বাসরুদ্ধ করে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামেও এভাবে আত্মহত্যা করবে। আর যে ব্যক্তি অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামেও এভাবে আত্মহত্যা করতে থাকবে'।[৩৪]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِى يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِى يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِى بَطْنِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.

(৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে অনুরূপভাবে (পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে পড়ে) আত্মহত্যা করতেই থাকবে এবং উহা হবে তার স্থায়ী বাসস্থান। যে ব্যক্তি বিষ পানে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ তার হাতে থাকবে, জাহান্নামে সে সর্বক্ষণ বিষ পান করে আত্মহত্যা করতে থাকবে। আর উহা হবে তার স্থায়ী বাসস্থান। আর যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে লৌহাস্ত্রই তার হাতে থাকবে। জাহান্নামে সে তা নিজ পেটে ঢুকাতে থাকবে, আর সেখানে সে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে'।[৩৫]

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ فِى الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ.

(৫) ছাবেত বিন যাহ্হাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যে বস্তু দ্বারা দুনিয়ায় আত্মহত্যা করবে, তাকে ক্বিয়ামত দিবসে সে বস্তু দ্বারাই শাস্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তিকে অভিশম্পাত করল সে যেন তাকে হত্যা করে ফেলল, আর যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তিকে মিথ্যা অপবাদ দিল সেও যেন তাকে হত্যা করে ফেলল'।[৩৬]

উল্লেখ্য যে, মুনাফিকরা কাফেরদের চেয়েও নিকৃষ্ট এবং তাদের ক্ষতি কাফেরদের চেয়েও কঠিন, সে কারণে তাদের বসবাস হবে জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে। ইসলাম বিরোধী বহু কথা ও কাজ তাদের মাধ্যমে নবী করীম (ছাঃ)-এর যামানায় প্রকাশ পেয়েছে, ওহোদ যুদ্ধে শরীক না হয়ে কয়েক শত যোদ্ধাকে উসকিয়ে দিয়ে তাদেরকে সাথে করে আব্দুল্লাহ

৩০. *ছহীহ বুখারী, 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়, হা/৩০৯৫, 'তাওহীদ' অধ্যায়, হা/৬৮৮০; ছহীহ মুসলিম, 'যাকাত' অধ্যায়, হা/১৭৬২।*
৩১. *ইবনু মাজাহ, ভূমিকা, হা/১৬৯, তিরমিযী, 'কুরআনের তাফসীর' অধ্যায়, হা/২৯২৬।*
৩২. *ছহীহ বুখারী, 'জানাযা' অধ্যায়, হা/১২৭৫।*
৩৩. *বুখারী, জানাযা অধ্যায়, হা/১২৭৫।*
৩৪. *ছহীহ বুখারী, 'জানাযা' অধ্যায়, হা/১২৭৬।*
৩৫. *ছহীহ বুখারী, 'চিকিৎসা' অধ্যায়, হা/৫৩৩৩; ছহীহ মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায়, হা/১২৭৬।*
৩৬. *ছহীহ বুখারী, 'আদব' অধ্যায়, হা/৫৫৮৭, ৫৬৪০।*

ইবনু উবাই বিন সালূলের মদীনায় ফিরে আসা, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই বিন সালূলের পক্ষ থেকে সর্বাধিক লাঞ্ছিত বলা এবং মদীনা থেকে তাঁকে ও তাঁর ছাহাবীদেরকে বের করে দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা।[৩৭] এগুলো সবই কুফরী কাজ। এর পরেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত মুনাফিক ও তার দলটির বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করেননি। একথা আশা করি কোন চরমপন্থী খারেজী ও তাদের মতবাদপুষ্ট বাংলার কোন ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারবে না। এক্ষণে প্রশ্ন উঠে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের অনেককে নাম সহ জানতে পেরে এবং তাদের ডজন ডজন ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ ও কুফরী প্রকাশ পাওয়ার পরেও তাদের বিরুদ্ধে কেন সশস্ত্র জিহাদ করেননি। তবে কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র এই নির্দেশকে অস্বীকার করেছেন?

يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ.

'হে নবী! আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন এবং তাদের উপর কঠোরতা আরোপ করুন' *(তাহরীম ৯)*।

এর সঠিক জবাব কি? মুনাফিকদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সশস্ত্র জিহাদ না করে যবান দ্বারাই জিহাদ করে যদি ক্ষান্ত হন, তবে কোন যুক্তিতে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা হবে? এদেরকে যদি মুনাফিকও ধরা হয় তবুও তো তারা সশস্ত্র যুদ্ধের যোগ্য নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করেননি, একথা সর্বজন বিদিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে ক্ষমতা ও পর্যাপ্ত পরিমাণে সমরাস্ত্র থাকার পরেও তাদের হত্যা করেননি। অথচ চরমপন্থীরা সেই নবীর অনুসারী হয়ে এই লঘুসংখ্যা নিয়ে, নিরস্ত্র হয়ে যাচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করতে? নিঃসন্দেহে এটা আত্মহত্যার পথ, মুসলিম উম্মাহকে সন্ত্রস্তকারী সন্ত্রাসী পথ। এটা জিহাদের নামে এক প্রকার সন্ত্রাস বৈ কিছুই নয়। একে অদূরদর্শিতার কারণে জিহাদ বললেও দূরদর্শী কোন বিজ্ঞ আলেম একে জিহাদ বলবেন না। বরং এটাই প্রকৃত সন্ত্রাস এবং জঙ্গীবাদ, যা থেকে ইসলাম সম্পূর্ণ পবিত্র। ইতিহাস প্রমাণ করে এ জাতীয় সন্ত্রাসী তৎপরতা যারাই চালিয়েছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এই উম্মতকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। উম্মতকে অকল্যাণ বৈ কিছুই তারা উপহার দিতে পারেনি।

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কোন অমুসলিম এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনা করার পূর্বে লক্ষ্য রাখতেন আযান শুনা যায় কি-না। আযান শুনতে পেলে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতেন, নতুবা আক্রমণ করতেন।[৩৮]

তাই বলি বন্ধুরা! তোমরা কি বাংলাদেশের কোথাও মুসলিমদের আযান শুনতে পাও না? না-কি ঐসব আযান দানকারীরা ও ছালাত আদায়কারীরা মুসলিম নয়? তাই তোমাদের এই জিহাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ বিরোধী। এ কাজে আর কত দিন লিপ্ত থাকবে? ফিরে এসো, সরল সঠিক পথে। স্বাভাবিকভাবে জীবন-যাপন কর। অহেতুক বাড়াবাড়ি, কঠোরতা, মুসলিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ প্রভৃতি থেকে বিরত হও। মানুষকে কোমলতা ও নম্রতার সাথে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দাও। আল্লাহদ্রোহী ফির'আউনের নিকট আল্লাহ মূসা ও হারূণ (আঃ)-কে দাওয়াতের জন্য পাঠিয়ে তাদেরকে তার সাথে নরম ভাষায় কথা বলতে বলেছিলেন *(ত্বা-হা ৪৩-৪৪)*। মনে রাখবে মুসলিম জাতি; ফির'আউন থেকে নিকৃষ্ট নয় এবং তোমরা মূসা ও হারূণ (আঃ) থেকে উত্তম নও। কাজেই তারা তোমাদের নরম ব্যবহারের আরো বেশী হক্বদার। তাদেরকে বোমা উপহার না দিয়ে সঠিক পথের দাওয়াত উপহার দাও।

তায়েফবাসী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কতইনা মন্দ আচরণ করেছিল! প্রস্তরাঘাতে তাঁকে তারা রক্তেরঞ্জিত করে দিয়েছিল। এরপরেও যখন 'কারনুস ছা'আলেব' নামক স্থানে তিনি হুঁশ ফিরে পান, তখন জিবরীল (আঃ) পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাসহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হন এবং বলেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আপনার কওম আপনার সাথে কী ব্যবহার করেছে তা আল্লাহ ভাল করেই শুনেছেন। অতএব তিনিই পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন আপনি তাকে যা ইচ্ছা নির্দেশ দিন। আপনি যদি চান মক্কায় অবস্থিত বিশাল দুই পাহাড় দিয়ে তাদেরকে পিষ্ট করে দিবে। এরপর পাহাড়ের সেই দায়িত্বশীল ফেরেশতা তাকে সালাম দিয়ে বললেন, আপনার কওম আপনার সাথে কী করেছে তা আল্লাহ শুনেছেন, আমি পাহাড়ের ফেরেশতা আপনার প্রতিপালক আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, আপনার যা ইচ্ছা আমাকে নির্দেশ দিন। আপনি যদি চান মক্কায় অবস্থিত বিশাল দুই পাহাড় দিয়ে তাদেরকে পিষ্ট করে দিব। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন,

بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

'(না) বরং আমি কামনা করি আল্লাহ তাদের ঔরষ থেকে এমন ব্যক্তিদের বের করবেন যারা একমাত্র এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না'।[৩৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কত দয়াবান ছিলেন! তায়েফবাসী তাঁর সাথে অতি জঘন্য ব্যবহার করার পরেও তিনি তাদের ধ্বংস চাননি; বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। মক্কা বিজয় দিবসেও তিনি মুষ্টিমেয় কিছু লোক ব্যতীত সমস্ত কাফিরদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। অথচ ইচ্ছা করলে তিনি তাদের সকলকে হত্যা করতে পারতেন। কেননা তাঁর হাতেই ছিল নেতৃত্ব ও ক্ষমতা। অতএব আমরা সকলে সেই দয়ার নবীর আদর্শে আদর্শবান হই। মানুষকে কোমলতা ও নম্রতার সাথে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেই। আল্লাহ সকলকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করুন- আমীন!!

---

৩৭. *বুখারী, 'তাফসীর' অধ্যায়, হা/৪৫২৭; মুসলিম, হা/৪৬৮২।*
৩৮. *মুসলিম, হা/৫৭৫ 'ছালাত' অধ্যায়।*
৩৯. *বুখারী, হা/২৯৯২ 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়; মুসলিম, হা/৩৩৫২ 'জিহাদ' অধ্যায়।*

নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রথাঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী

*মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন**

আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি প্রাণীকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন *(সূরা নাবা ৮)*। সৃষ্টির প্রথম মানুষ আদম (আঃ) -এর একাকীত্ব দূর করে প্রশান্তি দানের লক্ষ্যেই মূলতঃ সৃষ্টি করা হয় মা হাওয়া (আঃ)-কে। তাই নারী-পুরুষ একে অপরের সান্নিধ্য পেতে চায় এবং এর মাধ্যমে খুঁজে পায় প্রশান্তি। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْآ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

'এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক। আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে' *(রূম ২১)*।

নারী-পুরুষ পারস্পরিক প্রয়োজনেই একত্রিত হয়। আর এই একত্রিত হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হ'ল বিবাহ। সকল সভ্য সমাজে বিবাহ প্রথা প্রচলিত। বিবাহ বিহীন নারী-পুরুষ একত্রে জীবন যাপন করা নিন্দনীয়, অসভ্য এবং ইসলামে তা অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আল্লাহ পাক মানুষের প্রকৃতিতেই নারী-পুরুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। জৈবিক চাহিদা মিটানোর প্রয়োজনে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিবাহ শুধু দু'জন ব্যক্তিরই নয়; বরং দু'টি পরিবারের মধ্যে সৃষ্টি করে গভীর সম্পর্ক। দু'টি পরিবার মায়া-মমতা-ভালবাসা ও ত্যাগ স্বীকারের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু এ মধুর সম্পর্ক যৌতুক নামের এক অমানবিক কুপ্রথা দ্বারা বিনষ্ট হয়। দু'টি পরিবারের মধ্যে সৃষ্টি করে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও তিক্ততা। দেশে নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ হ'ল এই যৌতুক প্রথা। বিবাহ-বিচ্ছেদ, হত্যা, নির্যাতন, আত্মহত্যা, মামলা-মোকদ্দমা নানাবিধ সমস্যা জড়িয়ে আছে যৌতুককে কেন্দ্র করে। এর শিকড় খুবই গভীরে। ছেলেপক্ষ ধরেই নিয়েছে যে যৌতুক গ্রহণ তাদের একটা অধিকার এবং কন্যাপক্ষ তা দিতে বাধ্য। সাম্প্রতিককালে সংবাদপত্রে চোখ রাখলেই সর্বাগ্রে চোখে পড়ে নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, শিশু ধর্ষণ, যৌতুকের কারণে হত্যা, আত্মহত্যা ইত্যাদি। আলোচ্য নিবন্ধে নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রথা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হ'ল-

* *প্রভাষক, আরবী বিভাগ, হামিদপুর আল-হেরা ডিগ্রী কলেজ, যশোর।*

নারী নির্যাতনের সংজ্ঞাঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রকট রূপ ধারণ করেছে। সমাজের প্রতিটি মানুষ এ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা রাখে। নারী নির্যাতন বলতে সাধারণভাবে নারীদের প্রতি যেকোন ধরনের অত্যাচার-অনাচার বুঝায়। এ নির্যাতন দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সহ বিভিন্ন ধরনের হ'তে পারে। অন্যদিকে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী, পুত্র-কন্যা, দেবর-ননদসহ সমাজের যে কারো দ্বারা নির্যাতন সংঘটিত হ'তে পারে। শুধু পুরুষদের দ্বারা নারীরা নির্যাতিত হয় একথাটি সর্বাঙ্গ সঠিক নয়। বরং অধিকাংশ নারী নির্যাতনের ঘটনা অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে অন্য একজন নারী।[১]

নারী নির্যাতন একটি ব্যাপক অর্থবহ প্রত্যয়। সাধারণভাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অর্থ বা বল প্রয়োগে কিংবা ভয় দেখিয়ে তাকে কোন কিছু করতে বাধ্য করাই নারী নির্যাতন। আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়, নারীর শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি কর্তৃক বিভিন্ন অজুহাতে নারীর উপর দৈহিক ও মানসিকভাবে নিপীড়ন চালানো নারী নির্যাতন। দৈহিক নির্যাতনে মৃত্যুবরণ এবং মানসিক নির্যাতনে আত্মহত্যা হ'ল নারী নির্যাতনের শেষ পরিণতি। ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘ প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদনে লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা ও নির্যাতনের (Gender violence) সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Gender Violence is a violence against women that results in physical, mental, sexual coereion or arbitrary deprivation and a violation of human rights'-এ সংজ্ঞানুযায়ী শারীরিক, মানসিক, যৌন নির্যাতন, যৌতুক অনাদায়ে নির্যাতন, ধর্ষণ, নারী পাচার, লিঙ্গীয় শোষণ, যৌন হয়রানি, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ প্রভৃতি সব ধরনের নির্যাতনই নারী নির্যাতনের পর্যায়ভুক্ত।[২]

বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে নারী নির্যাতন নিবর্তক আইনে নারী নির্যাতনের একটি কার্যকরী সংজ্ঞা (Operational definition) দেয়া হয়েছে। উক্ত আইনে নারী নির্যাতন বলতে যৌতুক প্রথা, যৌতুকের জন্য দৈহিক ও মানসিকভাবে চাপ প্রয়োগ, অপহরণ, পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা, ধর্ষণ, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে, এসিড নিক্ষেপ, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, বিদেশে পাচার ইত্যাদি অপরাধকে বোঝানো হয়েছে।[৩]

১. *অধ্যাপক আব্দুল হালিম মিয়া, উচ্চ মাধ্যমিক সমাজকল্যাণ, দ্বিতীয় পত্র (ঢাকাঃ হাসান বুক হাউস, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, জুন ২০০৬), পৃঃ ৯।*
২. *Professor Rebeka Sultana, Maksuda Begum and Md Imtiusuddin, Introductory of Sociology: A Text Book of social science, (Dhaka: 3rd Edition, April-2007), P. 409-410।*
৩. *প্রফেসর মোঃ আতিকুর রহমান, স্নাতক সমাজকর্ম, (ঢাকাঃ কোরআন মহল, প্রথম সংস্কারণ পুনঃ মুদ্রণ মে-২০০৭), পৃঃ ১৭৭।*

যৌতুক প্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধির জাঁতাকলে পড়ে বাংলাদেশের অগণিত নারী অকালে অবেলায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। জীবনের স্বপ্ন-স্বাদ অপূর্ণ রেখেই পরলোকে পাড়ি জমাতে হচ্ছে। অত্যাচার-নির্যাতন সয়ে সয়ে খড়কুটার মত বেঁচে থাকতে হচ্ছে অনেককে। সুতরাং সামাজিক শৃংঙ্খলা এবং নারীর মান-সম্ভ্রম রক্ষার খাতিরে এ প্রথার উচ্ছেদ সাধন একান্ত আবশ্যক।

যৌতুক অর্থঃ

যৌতুক বাংলা শব্দ। এর প্রতিশব্দ হচ্ছে পণ। যৌতুক এবং পণ শব্দ দু'টি একই অর্থ প্রকাশ করে এবং উভয় শব্দ এসেছে সংস্কৃত থেকে। প্রচলিত অর্থে যৌতুক হ'ল- শর্ত আরোপের মাধ্যমে বাধ্য করে কন্যার অভিভাবক থেকে অর্থ, অলংকার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আদায় করা।[৪] সাধারণভাবে কনের অভিভাবক মেয়ের ভবিষ্যৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করে বিবাহের সময় মূল্যবান অলংকার, আসবাবপত্র, নগদ অর্থ, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ইত্যাদি প্রদান করে থাকে। একেও যৌতুক বলা হয়। মেয়েকে ভাল পাত্রের হাতে তুলে দেয়ার অভিলাষে অর্থাৎ অভিভাবকের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য স্বেচ্ছায় কনে পক্ষ যৌতুক দিয়ে থাকে।[৫] The Dowry prohibition Act-1980-এর বিধান মোতাবেক যৌতুক বলতে বিবাহের এক পক্ষের দ্বারা অপর পক্ষের প্রতি অথবা বিবাহের সময় বা পূর্বে যেকোন সময় উক্ত পক্ষগণের বিবাহের প্রতিদান হিসাবে অপর পক্ষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দিতে সম্মত হওয়া সম্পত্তি বা জামানতকে বুঝানো হয়েছে।[৬] পরিভাষায় যৌতুক বলতে বিবাহে কন্যা পক্ষ কর্তৃক বর পক্ষকে বাধ্যতামূলক প্রদেয় মাল-সামানাকে বুঝায়।

যৌতুকের জন্য ব্যবহৃত সমার্থবোধক শব্দঃ

বখশীশ, খরচপাতি, খুশি করানো, সুদৃষ্টি, সম্মানী, ম্যানেজ, কমিশন, নেগোসিয়েট, এক্সট্রা ক্লিয়ারেন্স ইত্যাদি।[৭]

যৌতুকের ইতিহাসঃ

যৌতুক প্রথার পটভূমি আলোচনা করলে দেখা যায় যে, হিন্দু সমাজ থেকে এর উৎপত্তি। হিন্দু আইনে পৈত্রিক সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার স্বীকৃত না থাকায় কন্যা পাত্রস্থ করার সময় নগদ অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী দেওয়ার প্রথা হিন্দু সমাজে স্মরণাতীতকাল থেকে চলে আসছে। আদিতে বর-কনের নতুন সংসার সাজানোর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি বিয়েতে উপহার হিসাবে দেয়া হ'ত। সময়ের পরিবর্তনে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিবর্তন হয়ে সর্বনাশা যৌতুক প্রথার রূপ লাভ করে। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে এটি মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে।[৮]

যৌতুক দাবীর কারণঃ

(১) পাত্রের অর্থনৈতিক দূরাবস্থা যৌতুক দাবীর অন্যতম কারণ। দরিদ্র, বেকার কিংবা অল্প আয়ের পাত্র কিংবা তার অভিভাবক অর্থনৈতিক সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে যৌতুক দাবী করে থাকে।

(২) আমাদের সমাজে অনেকেই নিজের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে যৌতুক দাবী করে। এরা ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্নে অর্থ, জমি, বাড়ী ও মূল্যবান আসবাবপত্র যৌতুক স্বরূপ দাবী করে।

(৩) যৌতুক অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক যোগ্যতা ও মর্যাদার মাপকাঠি বলে বিবেচিত হয়। যৌতুক পাওয়া না পাওয়ায় কিংবা কম পাওয়া বেশী পাওয়ায় পাত্রপক্ষ জিতেছে; নাকি হেরেছে এ রকম একটি মূল্যায়নের মনোভাব সমাজে রয়েছে।

(৪) যৌতুক প্রাপ্ত বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনের প্ররোচনায় অনেক সময় বিয়ে পরবর্তীকালেও পাত্রপক্ষ যৌতুক দাবি করে থাকে এবং নিকটজনের কাছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ বিষয়ে সমর্থন পেয়ে ক্রমাগত স্ত্রীর প্রতি চাপ প্রয়োগ করতে থাকে।

(৫) একশ্রেণীর পাত্রপক্ষ আছেন, যারা আর্থিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, বরং নিছক চিত্তবিনোদন বা সখ মেটানোর জন্য যৌতুক দাবী করে থাকেন।[৯]

(৬) অনুকরণপ্রিয়তা মানব চরিত্রের সহজাত প্রবৃত্তি। উচ্চ ও সম্পদশালীদের যৌতুক প্রদানের প্রবণতার অনুকরণে আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীতে যৌতুকের দাবি সম্প্রসারিত হচ্ছে।[১০]

যৌতুক প্রদানের কারণঃ

(১) বিবাহের বয়সসীমা অতিক্রমের আশংকা অনেকক্ষেত্রে যৌতুকের দাবীকে মেনে নিতে বাধ্য করে। আমাদের সমাজের মেয়েদের বিয়ের বয়সসীমা পুরুষের তুলনায় কম। ১৯২৯ সালে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনে মেয়েদের বিবাহের বয়স ১৮ বছর ধার্য করা হ'লেও সামাজিক নিয়মে ১৫ বছর থেকে ২৭ বছরের মধ্যে মেয়ের বিবাহ দিতে না পারার গ্লানি থেকে কন্যাপক্ষ যৌতুক প্রথা মেনে নিতে বাধ্য হয়।[১১]

(২) মেয়ে দেখতে সুশ্রী না হওয়া, গোত্রীয় অহমিকাবোধ,

৪. *মুহাম্মাদ সিরাজুল হক সম্পাদিত যৌতুক ও ইসলাম, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ২০০৪), পৃঃ ১৮১।*
৫. *মসজিদ সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, (যশোরঃ বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, যশোর যেলা শাখা, প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর ২০০৬, পৃঃ ৫২-৫৩।*
৬. *মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজ কল্যাণ পরিচিতি [অনার্স নন-মেজর কোর্স], (ঢাকাঃ অনার্স পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ২০০২), পৃঃ ১৩৮।*
৭. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।*
৮. *প্রফেসর রেবেকা সুলতানা, মাকসূদা বেগম, ইমতিয়াজ উদ্দিন, সমাজ বিজ্ঞানের ভূমিকা (Wide publications, প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট ২০০৪, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল- ২০০৭), পৃঃ ৪১৯।*
৯. *মুহাম্মাদ সিরাজুল হক সম্পাদিত যৌতুক ও ইসলাম, পৃঃ ৫২-৫৩।*
১০. *সমাজ বিজ্ঞানের ভূমিকা, পৃঃ ৪২১।*
১১. *যৌতুক ও ইসলাম, পৃঃ ৫৩।*

মেয়ে কালো হওয়া, তথাকথিত উচ্চবিত্ত গোত্রের ছেলের সাথে মেয়েকে পাত্রস্থ করার মোহ, মেয়েদের দৈহিক কোন অঙ্গে ত্রুটি থাকা ও মেয়েদের প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণেও অনেক সময় পাত্রীপক্ষ নিজস্ব উদ্যোগে স্বেচ্ছায় যৌতুক প্রদান করে।

(৩) উচ্চবংশ, উচ্চশিক্ষা, উচ্চবিত্ত ইত্যাদি নির্বাচন করতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রে তুলনামূলক নিম্ন মর্যাদার কন্যাপক্ষ স্বেচ্ছায় যৌতুক প্রদান করে থাকে।

(৪) কন্যার ভবিষ্যৎ জীবন সুখময় হবে এ রকম প্রত্যাশা থেকেও পিতামাতা পাত্রপক্ষকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যৌতুক দিয়ে থাকে।

(৫) মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ যৌতুক প্রদানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কন্যাপক্ষ দায়গ্রস্ত এবং পাত্রপক্ষ উদ্ধারকর্তা, অতএব পাত্র পক্ষকে সন্তুষ্ট করতে পিতা-মাতা যৌতুক প্রদানে বাধ্য হন।

(৬) সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এমন ধারণা থেকেও অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার উচ্চহারে যৌতুক প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সমস্যা না থাকলেও পরোক্ষভাবে সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।[১২]

যৌতুক প্রথা সমাজের জন্য এক মারাত্মক অভিশাপ। এ অভিশাপে জর্জরিত হয়ে শত শত পরিবার আজ জাহান্নামের নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে। শত সম্ভাবনাময় জীবন ধ্বংস হয়েছে। শত শত শিক্ষিত তরুণী জীবনের হতাশা, দুঃখ নির্যাতনের গ্লানি ও যৌতুকের অভিশাপ হ'তে মুক্তি প্রত্যাশায় আত্মহত্যার মত জাহান্নামের পথ বেছে নিয়েছে। এক কথায় যৌতুকের অভিশাপ আমাদের সমাজ জীবনে লেলিহান অগ্নিশিখার মত বিস্তার লাভ করছে। বাড়ীগাড়ী ব্যবসায়ের মূলধন যৌতুক হিসাবে গ্রহণের পর কিছুদিন অতিক্রান্ত না হ'তেই আরও যৌতুকের দাবী পূরণে ব্যর্থ তরুণীকে গলাটিপে হত্যা করে বৈদ্যুতিক ফ্যানের সাথে ওড়না দিয়ে লটকিয়ে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেয়ার ঘটনাও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। যৌতুকের অভিশাপ ও কুপ্রভাব চিন্তা করলে সমাজের প্রতিটি কল্যাণকামী চিন্তাশীল ব্যক্তির অন্তরাত্মা প্রকম্পিত হয়ে উঠবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে যৌতুকঃ

ইসলামী বিধান অনুযায়ী বিয়ের সময় একমাত্র যে আর্থিক লেনদেন হবে তা হচ্ছে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত মোহরানা। মোহরানার সম্পূর্ণ টাকা স্ত্রীর পাওনা। এতে অন্য কারো অংশ নেই। একজন পুরুষ তার আদরের কন্যাকে অনেক যত্ন করে বড় করেছেন। বিয়ের মাধ্যমে অন্য এক পুরুষের সংসার করার জন্য একটি নতুন পরিবেশে চিরদিনের জন্য তাকে বিদায় দিয়ে দেয়া হচ্ছে। স্বামীর বাড়ীতে সবাই অপরিচিত। সকল অপরিচিত লোককে আপন করে সেখানে তাকে বসবাস করতে হবে। যিনি এত বড় ঝুঁকি নিয়ে স্বামীর বাড়ীতে আসলেন তার একটি নিরাপত্তার প্রয়োজন। সে নিরাপত্তার জন্যই ইসলাম নারীর জন্য মোহরানা নির্ধারণ করেছে। আর এ হচ্ছে বিবেক ও যুক্তিসঙ্গত দাবী। মোহরানা না দিয়ে উল্টো কন্যার পিতার উপর যৌতুক চাপানো সম্পূর্ণ অমানবিক ও জঘন্য যুলুম।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছেন বিবাহের সময় তার স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান করতে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশি মনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর' *(নিসা ৪)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায় এটা তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্য সব নারী হালাল করা হয়েছে। শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য ব্যভিচারের জন্য নয় *(নিসা ২৪)*।

মোহর প্রদানের হুকুম থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও বাদ ছিলেন না। তাঁকেও মোহর প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! আমি আপনার জন্য বৈধ করেছি আপনার স্ত্রীদেরকে, যাদের মোহর আপনি প্রদান করেছেন' *(আহযাব ৫০)*। উকবা ইবনু আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে শর্তের বিনিময়ে তোমরা (স্ত্রীদের) লজ্জাস্থান হালাল কর, তা অবশ্যই তোমাদেরকে পূরণ করতে হবে'।[১৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কম বা বেশী মোহর ধার্য করে কোন নারীকে এই নিয়তে বিয়ে করে যে উক্ত মোহর দিবে না, বস্তুতঃ তাকে ধোঁকা দিল। অতঃপর সে তার স্ত্রীর হক্ব তথা মোহর না দিয়ে মৃত্যুবরণ করল, সে ব্যভিচারী হিসাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে'।[১৪] আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'চারটি গুণ দেখে নারীকে বিবাহ করা হয়, ধন-সম্পদ, বংশ-মর্যাদা, সৌন্দর্য, ধর্ম পরায়ণতার কারণে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, লাভবান হ'তে যদি চাও তাহ'লে ধর্মপরায়ণাকে বিবাহ কর।[১৫]

যৌতুক প্রথার মূলে কুঠারাঘাত হেনেছে এ হাদীছ এবং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, যৌতুক তথা সম্পদের লোভে বিবাহ করলে আল্লাহ তাকে দরিদ্রতায় নিপতিত করবেন।

ইসলাম সম্পদ আহরণ ও তা ভোগের দু'টি পথ নির্ধারণ করে দিয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে বৈধ উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ, অন্যটি হচ্ছে নিজের শ্রম দ্বারা অর্জিত সম্পদ।

১২. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩।*

১৩. *বুখারী, হা/৫১৫১।*

১৪. *ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১৯২১, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৯, হা/১৮০৭, পৃঃ ৩৫২।*

১৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮২।*

অপরের শ্রম দ্বারা অর্জিত সম্পদ ভোগ করা যেমন অমর্যাদাকর, তেমনি সমাজতত্ত্ববিদদের মতে তা শ্রমশোষণ নামেও অভিহিত। ইসলামে সব ধরনের শোষণই হারাম। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ' *(নিসা ২৯)*।

বিবাহের সময় শর্ত হিসাবে বর কিংবা কনে পক্ষকে অর্থ প্রদানে বাধ্য করা নিঃসন্দেহে শ্রমশোষণ। কারণ এতে ভোক্তার কোন শ্রম বিনিয়োগ হয় না। শ্রম বিনিয়োগ হয় যৌতুক দাতার। সুতরাং বিবাহের যৌতুক হিসাবে উপার্জিত অর্থ অপরের শ্রম শোষণমূলক উপার্জিত অর্থ অর্থাৎ সূদ ও ঘুষের ন্যায় হারাম। সূদ ও ঘুষের অর্থে যেমন সূদখোর ও ঘুষখোরের কোন শ্রম বিনিয়োগ হয় না, বরং ঘুষ ও সূদ দাতার শ্রম দ্বারা উপার্জিত অর্থ শোষণ করে ভোগ করা হয় এবং ঘুষ ও সূদ দাতাকে নিঃস্ব করা হয়, তেমনি বিবাহের যৌতুক বা পণেও যৌতুক দাতার শ্রম দ্বারা উপার্জিত অর্থ ভোগ করা হয় এবং যৌতুক দাতাকে আর্থিকভাবে নিঃস্ব করা হয়।

আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুষদাতা এবং গ্রহীতার উপর লা'নত করেছেন।[১৬] সূদ-ঘুষকে যেমন হাদিয়া হিসাবে গণ্য করা যায় না, অনুরূপভাবে যৌতুককেও উপহার হিসাবে গণ্য করা যায় না। যৌতুককে যারা সূদ ও ঘুষের ন্যায় হারাম মানতে চাইবেন না, তারা অনুসন্ধিৎসু মনে একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাবেন সূদ ও ঘুষ হাদিয়া বা উপহার হিসাবে গণ্য না হওয়ার জন্য যেসব কারণ বিদ্যমান যৌতুকের ক্ষেত্রেও সেসব কারণ বিদ্যমান।

নারীর ক্ষমতায়নঃ

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে মেয়ে পিতা-মাতার সম্পত্তির অংশ পায়। প্রশ্ন উঠতে পারে মেয়েতো ছেলে অপেক্ষা অর্ধেক পেয়ে থাকে। আসলে আল্লাহ পাক মেয়ের প্রতি দায়-দায়িত্বও কম করে দিয়েছেন। একজন নারী পিতার সংসারে, ভাইয়ের সংসারে, স্বামীর সংসারে এবং ছেলের সংসারে পূর্ণ নিরাপত্তা পেয়ে থাকে। জন্মগতভাবেও শারীরিক, মানসিক উভয় দিক থেকে পুরুষ নারী অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্বশালী' *(নিসা ৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে জাতি কোন নারীকে কর্তৃত্বভার অর্পন করে সে জাতি কখনও সফলকাম হয় না'।[১৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'আমি যদি কোন ব্যক্তিকে অন্য কোন ব্যক্তির সামনে সিজদা করার নির্দেশ দান করতাম তবে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য।[১৮] কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা স্পষ্ট যে, শারীরিক, নৈতিক ও আর্থিক আক্রমণ থেকে নারীকে রক্ষার জন্য যেখানে পুরুষকে নারীর নেতা বানানো হয়েছে, সেখানে পুরুষ কর্তৃক নারীর নিকট থেকে বিবাহের সময় যৌতুক আদায় পুরুষের জন্য কত অবমাননাকর ও লজ্জাজনক তা সহজেই অনুমেয়। শুধু তাই নয় বর্তমান সময়ে যারা নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে বেশী ব্যস্ত এবং নারী স্বাধীনতা, নারী সমঅধিকার, নারী মুক্তি আন্দোলন ইত্যাদি পরিচালনা ও সহযোগিতা করছে, তাদের দ্বারাই বরং আজ নারী সমাজ বেশী অপদস্ত হচ্ছে। নারী মুক্তির মন্ত্র পাঠ করিয়ে নারীকে তারা আপন ভূবন থেকে বের করে ছেড়ে দিচ্ছে এমন মুক্তবাদীদের হাতে, যারা নারীর সম্ভ্রম লুণ্ঠনে পাকা তীরন্দাজ, নির্ভুল নারী শিকারী।

যৌতুক নিরোধ আইনঃ

১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হ'লেও এর যথাযথ প্রয়োগ নেই। তাই জনগণের জ্ঞাতার্থে আইনের কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

(১) **যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের দণ্ডঃ** এই আইন বলবৎ হওয়ার পর, কোন ব্যক্তি যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে অথবা যৌতুক প্রদান বা গ্রহণে সহায়তা করলে, সে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর মেয়াদের কারাদন্ড বা অর্থদন্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

(২) **যৌতুক দাবী করার দণ্ডঃ** কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কনে বা বরের পিতা-মাতা বা অভিভাবকের নিকট যৌতুক দাবী করলে সে সর্বাধিক পাঁচ বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।[১৯]

(৩) **যৌতুকের জন্য মৃত্যু ইত্যাদি ঘটানোর দণ্ডঃ** যৌতুকের কারণে কোন নারীর মৃত্যু ঘটলে বা গুরুতরভাবে আহত হ'লে তবে তার মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ১৪ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানা যোগ্য দণ্ড হবে।[২০]

নারী নির্যাতন ও যৌতুকপ্রথা প্রতিরোধে সুপারিশমালাঃ

যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি। ইহা নারী নির্যাতনের হাতিয়ার, তালাক ও দাম্পত্য কলহের প্রধান কারণ। সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও নারী নির্যাতন বন্ধ করার জন্য যৌতুক প্রতিরোধ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। যৌতুক ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য নিম্নে কতিপয় সুপারিশমালা পেশ করা হ'ল-

(১) আলোকিত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে প্রথম শ্রেণী হ'তে শিক্ষার সকল স্তরে প্রত্যেক ধর্ম বিশ্বাসী শিক্ষার্থীদের জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করনের ব্যবস্থা করতে হবে। মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য স্তরক্রমে আল-কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকে অধ্যয়ন করার দ্বীনি শিক্ষার

১৬. *আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭৫৩।*
১৭. *বুখারী হা/৪৪২৫, 'যুদ্ধ-বিগ্রহ' অধ্যায়, হা/৭০৯৯, 'ফিতান' অধ্যায়।*
১৮. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৩২৫৫ 'বিবাহ' অধ্যায়।*
১৯. *যৌতুক ও ইসলাম, পৃঃ ১০৯।*
২০. *সমাজকল্যাণ পরিক্রমা, পৃঃ ২০১।*

Contents

অনুশীলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ধর্মীয় চেতনাবোধ, ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি সুদৃঢ় প্রত্যয় ছাড়া নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত ও মটিভেশন ছাড়া মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মতো দায়িত্বশীল জনশক্তি সৃষ্টি হ'তে পারে না। সকল প্রকার অনৈতিকতা, মানবাধিকার হরণ, নারী অধিকার হরণ, যৌতুকের অভিশাপ, হত্যা, সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠন ও যুবশক্তির মধ্যে নৈতিক চেতনা সৃষ্টির একমাত্র কার্যকর পন্থা, ধর্ম ও নৈতিকতা ভিত্তিক শিক্ষা'।

(২) যৌতুক প্রথা, সন্ত্রাস সহ সকল মানবাধিক বিবর্জিত মৌলিক সমস্যাকে চিত্রিত করে নিউজ মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সকল সম্প্রচার মিডিয়াগুলোকে যৌতুক ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত ও গণচেতনা সৃষ্টির সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রচার মিডিয়ার বিজ্ঞপ্তিতে ব্যাপক সংস্কারধর্মী বিজ্ঞাপন ও শ্লোগান প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। জনমনে যৌতুক প্রথার মত সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে জাতীয় পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন ও প্রাইভেট চ্যানেলগুলোকেও ব্যাপক গণচেতনা সৃষ্টি, যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করতে হবে।

(৩) সরকারী নিবন্ধনপ্রাপ্ত কাযীগণ বিবাহ পড়ানোর আগে তথ্য সংগ্রহ করবেন বিবাহে কোন প্রকার যৌতুকের লেনদেন আছে কি-না? যদি থাকে তাহ'লে বিবাহ পড়ানো থেকে বিরত থাকবেন এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে অবহিত করবেন। এ ব্যাপারে সকল কাযীকে একমত হ'তে হবে। আর কোন কাযী যদি যৌতুকের বিবাহ পড়ান তাহ'লে তার নিবন্ধন বাতিল সহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(৪) নারীদের প্রতি নারীদের সুধারনা, আন্তরিকতা গড়ে তুলতে হবে। দেখা যায় নারীরা নারীদের শত্রু এবং তারা নিজেদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে শতকরা ৮৫ ভাগ। যেমন- নববধুকে শাশুড়ী ও ননদের হাতেই বেশী নিগৃহীত হ'তে হয়। একজন নারী তার ছেলে ও মেয়েকে সমান চোখে দেখতে পারে না। ছেলের প্রতি সুনজর এবং মেয়ের প্রতি বাঁকা নজর। নারীদের এ দৈন্যদশা কাটিয়ে উঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

(৫) নারীদের শিক্ষার জন্য সরকারী উদ্যোগে পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে এবং নারীদের পৃথক কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) যৌতুক নয়, বিয়ের অনুষ্ঠানে মোহরানা পরিশোধের জন্য বিবাহ নিবন্ধন ফরমে কলাম সংযুক্ত সহ স্ত্রীর প্রাপ্য পরিশোধের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা সরকারীভাবে থাকতে হবে।

(৭) যৌতুক বিহীন বিয়ের সরকারী পরিসংখ্যান থাকতে হবে এবং সেগুলো প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৮) আমরা যৌতুককে ঘৃণা করি, যৌতুক একটি ঘৃণ্য প্রথা, দন্ডনীয় অপরাধ ইত্যাদি শ্লোগান, সরকারী খামের উপর, দলীল বা সরকারী চিঠিপত্রে লিখে প্রচার করতে হবে।

(৯) নারী নির্যাতন ও যৌতুক নিরোধ আইন যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী এ জাতীয় অপরাধের সাথে যুক্ত বা সহায়তা দিচ্ছে কি-না তা সনাক্ত করণসহ উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(১০) নারী নির্যাতন ও যৌতুক বিষয়ক মামলাগুলো দ্রুত তদন্ত ও নিস্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

(১১) নারীদের ক্ষমতায়নের নামে নারীদের লাঞ্ছনার বস্তু বানানোর বিরুদ্ধে সোচ্ছার হ'তে হবে।

(১২) বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ ও আপোষকামীতা পরিহার করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন বিজাতীর অনুকরণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

(১৩) জুম'আর খুৎবাতে মুছল্লীদের নিকট যৌতুকের পরিহাস তুলে ধরতে হবে।

(১৪) জাতীয়ভাবে অবিবাহিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বেকারত্ব দূর হ'লে যৌতুক দাবীর প্রবণতা হ্রাস পাবে।

(১৫) বাল্য বিবাহ, নিস্প্রয়োজনে বহু বিবাহ ও যৌতুক প্রথা ভিত্তিক বিবাহ নিরুৎসাহিত, নিরসন কল্পে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয় ও তথ্য মন্ত্রণালয়কে পরিকল্পিতভাবে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(১৬) বিবাহে কুফূ বা সমকক্ষতার বিষয়ে বিশেষভাবে নযর রাখতে হবে।

(১৭) পাঠ্য বইতে যৌতুক বিরোধী লেখা সংযোজন, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদিতে যৌতুক সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি করে লেখা অন্তর্ভুক্ত করে ছাত্র/ছাত্রীদের যৌতুক বিরোধী মানসিকতা গড়ে তোলতে হবে।

পরিশেষে বলতে চাই হে যৌতুক প্রত্যাশী যুবক ও অভিভাবকবৃন্দ! যৌতুক একটি সামাজিক ক্যান্সার যা সকল মহল কর্তৃক স্বীকৃত। চিকিৎসা জগতের চরম সাফল্যের সময়ও বিশ্বে কোথাও ক্যান্সারের এ্যান্সার আবিস্কৃত হয়নি। তাই যৌতুক নামের সামাজিক ক্যান্সারের ন্যায় সত্যিই তোমার দেহের কোথাও যদি ক্যান্সার হয় তাহ'লে তার কোন এ্যান্সার মিলবে না। পরিণামে একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হবে। এমনকি একদিনের চিকিৎসার খরচও তুমি বহন করতে পারবে না। অতএব এসো! সুসভ্য ও উন্নত সমাজ গঠনের নিমিত্তে যৌতুকরূপী হারাম থেকে তওবা করে ফিরে আসি। এ জঘন্য প্রথা থেকে আল্লাহ আমাদের পরিত্রাণ দিন। আমীন!!

ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার ও পাশ্চাত্যে নারী স্বাধীনতার চালচিত্র

*নূরুল ইসলাম**

ভূমিকাঃ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে রয়েছে জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সুস্পষ্ট বিধান। কোন যুগ ও কালে সে বিধান অচল ও অকার্যকর নয়। অথচ যুগ-কালের বিবর্তনে ইসলামের বিধানকে অচল প্রমাণ করার জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে নানাভাবে বিষোদগার করা হচ্ছে। বর্তমানে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ সম্পদ প্রদান করার বিষয়টি নিয়ে ইসলাম বিদ্বেষী মহল ও তাদের নব্য শিষ্য তথাকথিত সুশীল সমাজ (?), এনজিও ও নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সোল এজেন্টরা বলছে, ইসলাম পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি মস্তবড় যুলুম করেছে। যে ইসলাম অধিকারবঞ্চিত নির্যাতিত-নিপীড়িত নারী জাতির ত্রাতারূপে আবির্ভূত হয়ে তাকে লাঞ্ছনার অতল গহ্বর থেকে টেনে তুলে এনে মর্যাদার রাজপথে পৌঁছিয়ে দিয়েছে, মীরাছ থেকে বঞ্চিত নারীকে জগতের ইতিহাসে প্রথমবারের মত মীরাছ প্রদান করেছে, তার বিরুদ্ধেই নারীর অধিকার হরণের নির্লজ্জ অপবাদ! কিন্তু এক্ষেত্রে সত্যিই কি ইসলাম নারীর প্রতি যুলুম করেছে? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এ প্রবন্ধে। সাথে সাথে পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ সম্পদ প্রদান করার তাৎপর্য ও দার্শনিক ব্যাখ্যা, নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় উচ্চকণ্ঠ পাশ্চাত্যে অবাধ নারী স্বাধীনতার নিষ্করুণ চিত্র, নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার নামে কুরআনিক বিধান পরিবর্তনের নেপথ্য কারণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচ্য প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

জাহেলী যুগে নারীর উত্তরাধিকারঃ

জাহেলী যুগে নারীদের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। চতুষ্পদ জন্তু বা ভোগ্যপণ্যের ন্যায় তাদেরকে উত্তরাধিকার সম্পদ রূপে গণ্য করা হ'ত। এমনকি পুরুষদের জন্য এমন কিছু খাবার নির্দিষ্ট ছিল, যা নারীদের জন্য ছিল নিষিদ্ধ।[১] সে সময় কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করাকে অবমাননাকর মনে করা হ'ত এবং তাকে জীবন্ত কবর দেয়া হ'ত। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ– يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ.

'তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে দিবে' *(নাহল ৫৮-৫৯)*। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ – بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. 'যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল' *(তাকভীর ৮-৯)*।

শুধু তাই নয়, জাহেলী যুগে নারীরা মীরাছ লাভ থেকে বঞ্চিত হ'ত। ইমাম কুরতুবী বলেন,

وكانوا فى الجاهلية لايورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا، ويقولون: لايعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل، وطاعن بالرمح، وضارب بالسيف، وحاز الغنيمة.

'জাহেলী যুগের লোকেরা নারী ও শিশুদেরকে উত্তরাধিকারী করত না। এমনকি শিশুরা পুরুষ হ'লেও। তারা বলত, মীরাছ কেবল তাকেই দেওয়া হবে যে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধ করে, বর্শা দ্বারা আঘাত করে, তরবারী দ্বারা যুদ্ধ করে এবং গনীমত লাভ করে'।[২] মোদ্দাকথা, জাহেলী যুগে উত্তরাধিকার লাভের মানদণ্ড ছিল পুরুষত্ব ও শক্তি-সামর্থ্য।

ইসলামে নারীর উত্তরাধিকারঃ

ইসলামের সূর্য উদিত হবার সাথে সাথে যাবতীয় যুলুম-নির্যাতন ও অন্যায়-অবিচারের বিদায় ঘণ্টা বেজে উঠল। যে নারীকে তার ন্যায্য প্রাপ্য উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, ইসলাম নারীর প্রতি কৃত সেই যুলুমের অবসান ঘটিয়ে তাকে জগতের ইতিহাসে প্রথমবারের মত মীরাছের অংশীদার নির্ধারণ করে বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে ঘোষণা দিল-

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا.

* এম.এ (শেষ বর্ষ), আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. *নিসা ১৯; আন'আম ১৩৮-৩৯; আবুল হাসান নাদভী, আস-সীরাতুন নাবাবিইয়াহ (জেদ্দাঃ দারুশ শুরূক, ১৯৮৪), পৃঃ ৩২; আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, আবকারিয়্যাতু মুহাম্মাদ (কায়রোঃ দারু নাহযাতি মিসর, ২০০২), পৃঃ ১২১।*

২. *তাফসীরে কুরতুবী (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৯৯৩), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩১।*

‘পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হৌক বা বেশীই হৌক, এক নির্ধারিত অংশ’ *(নিসা ৭)*।

উক্ত আয়াত সম্পর্কে সাইয়িদ কুতুব বলেন,

هذا هو المبدأ العام، الذى أعطى الإسلام به النساء منذ أربعة عشرقرنا، حق الإرث كالرجال– من ناحية المبدأ– كما حفظ به حقوق الصغار الذين كانت الجاهلية تظلمهم وتأكل حقوقهم. لأن الجاهلية كانت تنظر إلى الأفراد حسب قيمتهم العملية فى الحرب والإنتاج. أما الإسلام فجاء بمنهجه الربانى، ينظرإلى الإنسان– أولا– حسب قيمته الإنسانية. وهى القيمة الأساسية التى لا تفارقه فى حال من الأحوال! ثم ينظر إليه– بعد ذلك– حسب تكاليفه الواقعية فى محيط الأسرة وفى محيط الجماعة.

‘এটিই হচ্ছে সাধারণ মূলনীতি, যার মাধ্যমে ইসলাম মূলনীতির দিক থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে পুরুষের ন্যায় নারীকে উত্তরাধিকার প্রদান করেছে। অনুরূপভাবে উহার মাধ্যমে শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ করেছে। জাহেলী যুগের লোকেরা যাদের উপর অত্যাচার করত এবং যাদের হক বিনষ্ট করত। কারণ জাহেলী যুগের লোকেরা ব্যক্তির দিকে যুদ্ধ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের কর্মক্ষমতার মূল্যমানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখত। কিন্তু ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত মূলনীতির মাধ্যমে মানুষের দিকে প্রথমতঃ তার মানবিক মূল্যমানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। আর এটি ঐ মৌলিক মূল্যমান যা কোন অবস্থাতেই তার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। অতঃপর ইসলাম মানুষের দিকে পরিবার ও সমাজের পরিমণ্ডলে তার বাস্তব দায়িত্ব-কর্তব্যের দৃষ্টিকোণে দেখে’।[৩]

অন্যত্র মহান আল্লাহ নারীদের মীরাছ সম্পর্কে বলেন,

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِمِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.

‘আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান, কিন্তু কেবল কন্যা দুই-এর অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তাদের জন্য অর্ধাংশ...’ *(নিসা ১১)*।

উক্ত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হচ্ছে- সা‘দ বিন রাবী‘ (রাঃ)-এর স্ত্রী একদা সা‘দের ঔরষজাত দুই মেয়েকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এরা দু’জন সা‘দ বিন রাবী এর মেয়ে। তাদের বাবা সা‘দ আপনার সাথে ওহোদ যুদ্ধে অংশগ্রগহণ করে শহীদ হয়েছেন। তাদের চাচা তাদের প্রাপ্য সম্পদ আত্মসাৎ করেছে এবং তাদের জন্য কিছুই রাখেনি। অর্থ ছাড়া তাদের বিয়ে দেওয়াও যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ রায় দিবেন। এরপর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হ’ল ‘আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান...’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন তাদের চাচাকে এ নির্দেশ পাঠালেন যে, ‘সা‘দের মেয়েদেরকে দুই-তৃতীয়াংশ ও তাদের মাকে এক-অষ্টমাংশ দাও এবং অবশিষ্টাংশ তোমার জন্য রাখ’।[৪]

সূরা নিসার ১১ নং আয়াতের প্রেক্ষিতে নারীর সমঅধিকার (?) প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার তথাকথিত নারীবাদী সংগঠন, নারী নেত্রী, সুশীল সমাজের বক্তব্য হচ্ছে- ইসলাম নারীর চেয়ে পুরুষকে দ্বিগুণ সম্পদ প্রদান করে নারীর প্রতি যুলুম করেছে। অথচ কুরআন মাজীদে মৃত ব্যক্তির মীরাছ লাভকারীদের ৬টি নির্ধারিত অংশ বর্ণিত হয়েছে। যথা ১/২, ১/৪, ১/৮, ২/৩, ১/৩ এবং ১/৬ অংশ *(নিসা ১১-১২, ১৭৬)*। এ অংশগুলো লাভকারী ১২ জনের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৪ এবং নারীর সংখ্যা ৮ জন।[৫] এটা কি প্রমাণ করে যে, ইসলাম নারীর প্রতি অবিচার করেছে? যদি তাই হ’ত তাহ’লে ১২ জন মীরাছ লাভকারীর মধ্যে ৮ জন নারীকে অন্তর্ভুক্ত করত না। তাছাড়া সর্বক্ষেত্রে যে নারী পুরুষের চেয়ে মীরাছ কম লাভ করে তা কিন্তু নয়। ক্ষেত্রবিশেষে পুরুষের চেয়ে নারী বেশী পায়। এমনকি অর্ধেক পর্যন্ত পেয়ে থাকে। যেমন- কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রী, মেয়ে ও বাবা রেখে মারা যায় তাহ’লে স্ত্রী স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ, মেয়ে অর্ধেক এবং বাকী সম্পদ আছাবা হিসাবে বাবা পাবে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রী, মেয়ে ও বাবা-মা রেখে মৃত্যুবরণ করে তাহ’লে স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ, বাবা-মা প্রত্যেকে এক ষষ্ঠাংশ এবং মেয়ে পাবে অর্ধেক।[৬]

পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ সম্পদ প্রদান করার হিকমতঃ

পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ সম্পদ প্রদান করার নানাবিধ যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি হ’ল-

৩. *সাইয়িদ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন (জেদ্দাঃ দারুল ইলম, ১৯৮৬), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮১-৮২।*

৪. ছহীহ আবূদাঊদ, তাহক্বীক্ব; শায়খ আলবানী, হা/২৮৯১-৯২, সনদ হাসান।

৫. ডঃ ওয়াহবাহ আয-যুহায়লী, আল-ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (দামেশকঃ দারুল ফিকর, ১৯৮৯), ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৯০, ৩১৩।

৬. নিসা ১১-১২; ডঃ আমীর আব্দুল আযীয, নিযামুল ইসলাম (কায়রোঃ দারু ইবনিল জাওযী, ২০০৫), পৃঃ ১২৬।

***প্রথমতঃ** মহিলার প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা তার পিতা, স্বামী, ভাই, ছেলে বা অন্যান্য আত্মীয়ের উপর ওয়াজিব।*

***দ্বিতীয়তঃ** মহিলা কারো ব্যয়ভার বহনে আদিষ্ট নয়। পক্ষান্তরে পুরুষ পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও যাদের ব্যয়ভার তার উপর ন্যস্ত তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা গ্রহণে আদিষ্ট। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক তাহের মাহমূদ যথার্থই বলেছেন, In so doing, it enforces a perfect equilibrium in the families, keeping in sight the many varied financial responsibilities imposed on every man but on no woman.*[৭]

তৃতীয়তঃ পুরুষের ব্যয় অধিক এবং সম্পদের আবশ্যকতা ব্যাপক। সেহেতু মহিলার তুলনায় তার অর্থের প্রয়োজন ঢের বেশী। উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহাম্মাদ আলী আছ-ছাবূনী বলেন,

فكلما كانت النفقات على الشخص أكثر، والالتزامات عليه أكبر وأضخم.. استحق– بمنطق العدل والإنصاف– أن يكون نصيبه أكثرو أوفر.

'যেহেতু পুরুষের উপর ব্যয়ভার অধিক, তার দায়িত্ব বড়, সেহেতু ন্যায় ও ইনছাফের যুক্তিতে তার অংশ অধিক ও ব্যাপক হওয়াই বাঞ্ছনীয়'।[৮]

চতুর্থতঃ পুরুষ স্ত্রীকে মোহর প্রদান করে এবং তার ও সন্তানদের বাসস্থান এবং অন্ন-বস্ত্রের ব্যয়ভারও বহন করে। মহান আল্লাহ বলেন, وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ. 'জনকের কর্তব্য যথাবিধি সন্তানদের ভরণ-পোষণ করা' *(বাক্বারাহ ২৩৩)*।

পঞ্চমতঃ সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ এবং স্ত্রী ও সন্তান সবার চিকিৎসার খরচ পুরুষ বহন করে, মহিলা নয়।[৯]

জগদ্বিখ্যাত মুফাসসির হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন,

فقوله تعالى: (يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِيْ أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) أى يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم فى أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة، فناسب أن يعطى ضعفى ما تأخذه الأنثى.

'আল্লাহ্‌র বাণীঃ 'আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান'। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের ব্যাপারে ন্যায়-নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দিচ্ছেন। কেননা জাহেলী যুগের লোকেরা মীরাছের যাবতীয় অংশ মহিলাদের ব্যতীত শুধু পুরুষদেরকে দিত। ফলে মূল মীরাছের ব্যাপারে আল্লাহ তাদের মধ্যে সমতা বিধানের আদেশ দিয়েছেন এবং দুই শ্রেণীর মাঝে পার্থক্য সূচিত করে দুই নারীর অংশের সমান এক পুরুষের অংশ নির্ধারণ করেছেন। এটা এ কারণে যে, ভরণ-পোষণের খরচ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও উপার্জনের কষ্ট ছাড়াও বহুবিধ কষ্ট পুরুষকে সহ্য করতে হয়। কাজেই পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ সম্পদ প্রদান করাই যুক্তিযুক্ত'।[১০]

আল্লামা শানকীতী বলেন, উক্ত আয়াতে *(নিসা ১১)* পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানে এর কোন কারণ বা তাৎপর্য উল্লেখ করা হয়নি। একই সূরার অন্যত্র আল্লাহ সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ– 'পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্য যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে' *(নিসা ৩৪)*। এরপর তিনি বলেন,

لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائما، والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائما، والحكمة فى إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرا لنقصة المترقب ظاهرة جدا.

'কারণ অন্যের তত্ত্বাবধায়ক, তার প্রতি সম্পদ ব্যয়কারী সর্বদা সম্পদ হ্রাসের আশংকায় থাকে। পক্ষান্তরে যার তত্ত্বাবধান করা হয় এবং যার প্রতি সম্পদ ব্যয় করা হয়, সে সর্বদা সম্পদের আধিক্যের আশায় থাকে। কাজেই যে সম্পদের আধিক্যের প্রতীক্ষায় থাকে তার উপর ঐ ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেয়া খুবই যুক্তিসংগত যে সম্পদ হ্রাসের আশংকায় থাকে। যাতে তার ক্ষতি কিছুটা হ'লেও পূরণ হয়'।[১১]

সাইয়িদ কুতুব বলেন,

৭. H.S. Bhatia (ed.), Studies in Islamic law, Religion and Society (New Delhi: Deep and Deep Publications, 1996), P. 361.
৮. *মুহাম্মাদ আলী আছ-ছাবূনী, আল-মাওয়ারীছু ফিশ-শারী'আতিল ইসলামিইয়াহ (দামেশকঃ দারুল কলম, ১৯৯৭), পৃঃ ১৯।*
৯. *আল-মাওয়ারীছু ফিশ-শারী'আতিল ইসলামিইয়াহ, পৃঃ ১৮-১৯ নিযামুল ইসলাম, পৃঃ ১২৫।*
১০. *তাফসীর ইবনে কাছীর (কায়রোঃ মাকতাবাতুছ ছফা, ২০০৪), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৫।*
১১. *মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীতী, আযওয়াউল বায়ান (বৈরূতঃ আলামুল কুতুব, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৮।*

Contents

وليس الأمر فى هذا أمر محاباة لجنس على حساب جنس. إنما الأمر أمر توازن وعدل، بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى فى التكوين العائلى، وفى النظام الاجتماعى الإسلامى: فالرجل يتزوج امرأة، ويكلف إعالتها وإعالة ابنائها منه فى كل حال، وليست مكلفة نفقة للزوج ولاللأبناء فى أى حال.. فالرجل مكلف– على الأقل– ضعف أعباء المرأة فى التكوين العائلى، وفى النظام الإجتماعى الإسلامى. ومن ثم يبدو العدل كما يبدو التناسق بين الغنم والغرم فى هذا التوزيع الحكيم.

‘এ ব্যাপারটি (পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ সম্পদ প্রদান করা) তাদের কোন এক শ্রেণীর পক্ষপাতিত্ব করা নয়। বরং পরিবার গঠন ও ইসলামের সামাজিক শৃংখলা বিধানে নারী-পুরুষের দায়ভার বহন করার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ন্যায়নীতি ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপার। পুরুষ কোন মহিলাকে বিয়ে করে এবং সর্বাবস্থায় তার ও তার ঔরষজাত সন্তানদের লালন-পালনের ব্যয়ভার বহন করে। কোন অবস্থাতেই স্ত্রী স্বামী ও সন্তানদের জন্য ব্যয় করতে আদিষ্ট নয়। পরিবার গঠন ও ইসলামের সামাজিক শৃঙ্খলা বিধানে পুরুষ কমপক্ষে নারীর দ্বিগুণ দায়িত্ব পালন করে। এথেকে এই বিজ্ঞজনোচিত মীরাছ বণ্টনে যেমন ইনছাফ প্রকাশ প্রায়, তেমনি দায়িত্ব ও প্রাপ্তির সামঞ্জস্যতাও প্রকাশ পায়'।[১২]

মোদ্দাকথা, ইসলাম নারীর উপর কোন অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেনি। যাতে সে অর্থ উপার্জনের ন্যায় ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন দায়িত্ব থেকে মুক্ত থেকে সন্তান প্রতিপালন ও পারিবারিক দায়িত্ব নিশ্চিন্ত মনে পালন করতে পারে। ইসলাম নারীর ওপর কেন অর্থোপার্জনের ও পুরুষের ন্যায় দায়-দায়িত্ব বহনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করল না- এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সিরিয়ার প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ডঃ মুস্তাফা আস-সিবায়ী বলেন, ‘জীবিকা উপার্জনের জন্য নারীর বাইরে শ্রম দেয়ার চাইতে গৃহস্থালীর কাজে আত্মনিয়োগ করা তার মানবিক মর্যাদাকে আরো ভালভাবে নিশ্চিত করে। এক্ষেত্রে ইসলামের নীতি যে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। পূর্ববর্তী ধর্মমত ও আইনের মত ইসলাম গৃহবহির্ভূত কাজ তার জন্য নিষিদ্ধও করেনি, আবার তাকে এজন্য উৎসাহিতও করেনি যে, বাড়ীঘর ও পরিবারের কল্যাণের তোয়াক্কা না করে পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যত খুশী কাজ করুক- যেমনটি আধুনিক সভ্যতায় চলছে। বস্তুত এমন প্রাজ্ঞবিধান যে একমাত্র মহাকুশলী ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ্‌র রচিত বিধানই হ'তে পরে, তাতে কোন সন্দেহ নেই'।[১৩] উপরন্তু ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক বানিয়েছে। এখানে কারো হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। প্রফেসর তাহের মাহমূদ বলেন, Whatever any woman inherits is her absolute property. She is its unchallenged master during her lifetime.[১৪]

তাছাড়া বাহ্যিকভাবে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীর চেয়ে পুরুষের অংশ বেশী মনে হ'লেও নারীই বেশী পেয়ে থাকে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে পরিষ্কার করা যায়। কোন মৃত ব্যক্তি এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে মারা গেল এবং মীরাছ রেখে গেল ৩০০০/= টাকা। ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী মেয়ে পাবে ১০০০/= টাকা ও ছেলে পাবে ২০০০/= টাকা। উভয়ের বিয়ের সময় উপস্থিত হ'ল। ধরুন, ছেলে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ২০০০/= টাকা মোহর দিয়ে বিয়ে করল। ফলে পিতার কাছ থেকে সে যে পরিমাণ সম্পদের ওয়ারিছ হয়েছিল, তা স্ত্রীকে মোহর হিসাবে প্রদান করাতে তার কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। বিয়ের পর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, তথা ভরণ-পোষণের যাবতীয় খরচ তার উপরই ন্যস্ত। পক্ষান্তরে মেয়ে ২০০০/= টাকা মোহরের বিনিময়ে কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'ল। তাহ'লে মেয়ে বাবার কাছ থেকে ১০০০/= এবং স্বামীর কাছ থেকে মোহর বাবদ ২০০০/= টাকা পেল। মোট তার টাকার পরিমাণ হ'ল ৩০০০/=। অতঃপর ধনবান হওয়া সত্ত্বেও তার উপর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অর্পিত হয়নি। কারণ তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর। স্ত্রীর বাসস্থানসহ যাবতীয় খরচ প্রদানে স্বামী নির্দেশিত। যতক্ষণ স্ত্রী তার অধীনে থাকবে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, মেয়ের সম্পদ বৃদ্ধি পেল আর ছেলের সম্পদ কমে গেল।

সুধী পাঠক! তাহ'লে এবার চিন্তা করুন! ছেলে-মেয়ের মধ্যে কে বেশী সৌভাগ্যবান ও অধিক সম্পদের মালিক? ছেলে না মেয়ে? এটাই হচ্ছে ছেলে ও মেয়ের মীরাছ সম্পর্কে ধর্ম ও বিবেকপ্রসূত দর্শন।

মীরাছ বণ্টনে কম-বেশী করার পরিণতিঃ

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে সূরা নিসার ১১-১২ ও ১৭৬ নং আয়াতে মীরাছ বণ্টনের নিয়ম-নীতি বিধৃত করেছেন। যে এই নীতি বাস্তবায়ন করবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত এবং যে তালবাহানা ও কৌশল অবলম্বন করে এ বন্টনে কম-বেশী করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ‘এইসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটা মহাসাফল্য। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হ'লে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে' *(নিসা ১৩-১৪)*।

[চলবে]

১২. *ফী যিলালিল কুরআন ১/৫৮৫*।
১৩. *ডঃ মুস্তাফা আস-সিবায়ী, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, আকরাম ফারুক অনূদিত (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৪), পৃঃ ৩৩*।
১৪. *Studies in Islamic law, Religion and Society, P. 362.*

প্রতারণা

রফীক আহমাদ*

মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের মৌলিক চাহিদার বিপক্ষের প্রতিপাদ্যই অপরাধ। অপরাধ কত প্রকার এর উত্তর খুবই জটিল। তবে নাম বলতে গিয়ে অনেক প্রকার বেরিয়ে আসবে। যেমন মিথ্যা, অবিশ্বাস, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচার, অহংকার, প্রতারণা, উপহাস, প্রলোভন, বিশ্বাসঘাতকতা, সন্ত্রাস, ফিৎনা-ফাসাদ, নর হত্যা, মদ, জুয়া, ঘুষ, নেশা, জবরদস্তি, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি অসংখ্য অপরাধের নাম বেরিয়ে আসবে। এখানে শুধু একটি অপরাধ 'প্রতারণা' মানব জীবনের নৈতিক আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় জীবনের উপর কতখানি প্রভাব ফেলতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করব। প্রতারণা বলতে আমরা প্রবঞ্চণা, ঠকানি, জুয়াচুরি, ছলনা, শঠতা ইত্যাদি বুঝে থাকি। বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে আমাদের দেশে প্রতারণা একটি বহুল পরিচিত অপরাধ। প্রতারণা বিভিন্ন অবকাঠামো দ্বারা সুসজ্জিত। এটা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রতারকের সংখ্যাও বাড়ছে। এর ফলে মানব জীবনের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় প্রভাবের অবক্ষয় ঘটছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মানব সৃষ্টির প্রাক্কালে ইবলীস সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে দোষী সাব্যস্ত হয়। অতঃপর আল্লাহ্‌র সম্মুখে নতি স্বীকার না করে অহংকার প্রদর্শন করে এবং আল্লাহ্‌র দরবার হ'তে বিতাড়িত হয়ে শয়তানে পরিণত হয়। শয়তানের আবির্ভাব মানব জাতিকে পরীক্ষা করার একটা পরিকল্পনা মাত্র। মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য। পক্ষান্তরে শয়তানের উদ্ভব হয়েছে মানুষের ইবাদতে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ কারণেই শয়তান আল্লাহ্‌র দরবার হ'তে বিতাড়িত হয়েও মানুষকে এক আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করার অসংখ্য প্রণালী উদ্ভাবন করে থাকে। ঐসব প্রণালীর মধ্যে প্রতারণা অন্যতম। এটা মানবীয় একটি কুবুদ্ধি বা কুমতলব। শয়তানের সহায়তায় নফসের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হ'তে এর উদ্ভব ঘটে। মানব জাতিকে এর কবল হ'তে মুক্ত রাখার জন্য বহু প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ– إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوْا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ– اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيْرٌ.

'হে মানব! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারণা না করে এবং সেই প্রবঞ্চক (শয়তান) যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়। যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব। আর যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার' *(ফাতির ৫-৭)*।

মানব সৃষ্টির প্রথম অধ্যায়েই তার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে শয়তানের অনুপ্রবেশ ঘটে। অতঃপর স্বল্প সময়ের মধ্যে শয়তান কৃত্রিম কলা-কৌশল দ্বারা তার প্রতিহিংসার প্রথম মানব আদম (আঃ)-কে প্রভুর পরীক্ষায় পরাভূত করে। শয়তানের এই সাফল্যের মূলে প্রতারণা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। আমাদের অতি পরিচিত এই অবিস্মরণীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি করছি।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ঐতিহাসিক এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার অবয়ব তৈরী করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি আদমকে সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করেছে। কিন্তু ইবলীস সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আল্লাহ বললেন, আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোমাকে কিসে সিজদা করতে বারণ করল? সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। আল্লাহ বললেন, তুমি এখান থেকে যাও। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার নেই। অতএব তুমি বের হয়ে যাও। তুমি হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। সে বলল, আমাকে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, তোমাকে সময় দেয়া হ'ল। সে বলল, আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্যই তাদের জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকবো। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পিছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। আল্লাহ বললেন, বের হয়ে যাও এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমাণিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোমার পথে চলবে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব। হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। অতঃপর সেখান

* *শিক্ষক (অবঃ), কৃষ্ণচাঁদপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।*

থেকে যা ইচ্ছা খাও। তবে এই বৃক্ষের কাছে যাবে না, তাহ'লে তোমরা গোনাহগার হয়ে যাবে। অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে (শয়তান) বলল, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি, তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী। সে কসম খেয়ে বলল, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। অতঃপর প্রতারণা পূর্বক তাদেরকে সম্মত করে ফেলল। অনন্তর যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের উপর জান্নাতের পাতা জড়াতে লাগল। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদের এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু'?

তারা উভয়ে বলল, হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। আল্লাহ বললেন, তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফলভোগ করবে। তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে। হে বণী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহ্‌র কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে। হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় সে তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছে যাতে তাদের লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সেজন্য তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তানকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না। তারা যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন বলে, আমার বাপ-দাদাকে এমনি করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। আল্লাহ মন্দ কাজের আদেশ দেন না। এমন কথা আল্লাহ্‌র প্রতি কেন আরোপ কর, যা তোমরা জান না। আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তোমরা প্রত্যেক সিজদার সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রাখ এবং তাঁকে খাঁটি আনুগত্যশীল হয়ে ডাক। তোমাদেরকে প্রথমে যেমন সৃষ্টি করেছেন, পুনর্বারও সৃজিত হবে। একদলকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং এক দলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ধারণা করে যে তারা সৎ পথে আছে' *(আরাফ ১১-৩০)*।

মানব সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপেই ইবলীস আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে মানব জাতির প্রতি মর্যাদা দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। অতঃপর আল্লাহ্‌র দরবার হ'তে বহিস্কৃত হয়ে আল্লাহ্‌র সম্মুখেই মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ করে এবং উক্ত কাজের অনুমতি প্রার্থনা করে। মহান আল্লাহ তাকে অনুমতি দেন। এতে গর্বিত হয়ে অহংকারী শয়তান মানুষকে চতুর্মুখী আক্রমণের দ্বারা শুধু আল্লাহ্‌র খাছ বান্দাদের ছাড়া সকলকে পথভ্রষ্ট করার হুমকি দেয়।

ইবলীস প্রচুর জ্ঞানবুদ্ধি ও কলা-কৌশলের অধিকারী। সে জানত মানব জাতির দুর্বলতা কী এবং কোথায়। তাই প্রথম পদক্ষেপেই মানবতা ও ধর্মের পরীক্ষায় প্রতারণার অবতারনা করেছিল এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হয়েছিল। সেহেতু প্রথম মানব আদম (আঃ) ও হাওয়া উভয়েই ছিলেন সরল-সহজ ও পবিত্র। তাঁরা মিথ্যা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা বুঝতেন না। ফলে শয়তান ইবলীসের পক্ষে তাঁদেরকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করা সহজ হয়েছিল। আদম (আঃ) জানতেন না যে, শয়তানের কথায় আল্লাহ প্রদত্ত নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করলে তাঁরা উলঙ্গ হয়ে যাবেন এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ হবেন। পক্ষান্তরে শয়তান জানত নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করলে তাঁরা উলঙ্গ হয়ে নিজেদের গুপ্তাঙ্গ দেখতে পাবেন এবং আল্লাহ বিরাগভাজন হবেন।

আদম (আঃ) নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে বিবস্ত্র হয়ে পড়ে আল্লাহ্‌র নিকট লজ্জিত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং ক্ষমাপ্রার্থী হলেন। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করলেন।

অতঃপর সব মানব সন্তানকে সম্বোধন করে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রত্যেক কাজে শয়তান থেকে বেঁচে থাক। সে যেন আবার তোমাদের ফাসাদে ফেলে না দেয়, যেমন তোমাদের পিতা-মাতা আদম ও হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করিয়েছে এবং তাদের পোশাক খুলে উলঙ্গ করার কারণ হয়েছে। সে তোমাদের জাতশত্রু। সুতরাং সর্বদা তার শত্রুতার প্রতি লক্ষ্য রাখ।

আমরা ঈমানদার বা বিশ্বাসীর দল সন্দেহাতীতভাবেই জানি মহাপবিত্র আল-কুরআন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশমালা। এসব উপদেশ অবতীর্ণ হয়েছে সেই সব মানুষের জন্য যারা দৈনন্দিন জীবনে সহজ-সরল ভাষায় অভ্যস্ত। অবশ্য এর ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহ তা'আলা

Contents

এক দল লোককে হেদায়াত দান করেছেন এবং একদলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। হেদায়াতপ্রাপ্তরা অবশ্যই পবিত্র কুরআনে পুরোপুরি বিশ্বাসী। অপরদিকে শয়তানের কুমন্ত্রণায় জড়িতরাই সন্দেহ পোষণকারী এবং পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। এদের ভ্রান্ত ধারণার অবসানকল্পে এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদের মনোযোগ বৃদ্ধির প্রয়াসেও আল্লাহ বহু আয়াত অবতীর্ণ করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ.

'যাকে মন্দ কর্ম (শয়তান কর্তৃক) শোভনীয় করে দেখানো হয়, সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি সমান যে মন্দকে মন্দ মনে করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন' *(ফাতির ৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ- إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ- وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَىِّ ثُمَّ لاَيُقْصِرُوْنَ.

'যদি শয়তানের প্ররোচনা আপনাকে প্ররোচিত করে, তাহ'লে আল্লাহ্র শরণাপন্ন হৌন। তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে যারা শয়তানের ভাই, তাদেরকে সে ক্রমাগত পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। অতঃপর তাতে কোন কমতি করে না' *(আ'রাফ ২০০-২০২)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ.

'নিশ্চয়ই যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্য তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়' *(মুহাম্মাদ ২৫)*।

মানুষকে সত্যপথ হ'তে বিচ্যুত করার উপায় বা পন্থাসমূহের মধ্যে প্রতারণাই শীর্ষস্থানীয়। প্রতারণার ক্ষমতা প্রতারক শয়তান বা তার দলবল অনেক সময় অলৌকিক শক্তির মত কাজে লাগানোর চেষ্টা করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করে। মানুষের প্রতি শয়তানের দুর্বার অভিযান শুরু হতে অদ্যাবধি প্রচণ্ড গতিতে চলে আসছে এবং সকল নবী যুগেও একইভাবে ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব মহানবী (ছাঃ)-কে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের উপর শয়তানের প্রতারণার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেছেন।

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَايَفْتَرُوْنَ.

'একইভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে। তারা ধোঁকা দেয়ার জন্য একে অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়। যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন তবে তারা এ কাজ করত না' *(আন'আম ১১২)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَى أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ- وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

'আল্লাহ্র কসম, আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর শয়তান তাদেরকে কর্মসমূহ শোভনীয় করে দেখিয়েছে। আজ সেই তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আমি আপনার প্রতি এজন্যই গ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে আপনি সরল পথ প্রদর্শনের জন্য তাদেরকে পরিষ্কার বর্ণনা করে দেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে এবং ঈমানদারকে ক্ষমা করার জন্য' *(নাহল ৬৩-৬৪)*।

وَعَادًا وَّثَمُوْدَا وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسَكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ-

'আমি আদ ও ছামূদকে ধ্বংস করেছি। তাদের বাড়ী-ঘর থেকেই তাদের অবস্থা তোমাদের জানা হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল যদিও তারা ছিল বুদ্ধিমান' *(আনকাবূত ৩৮)*।

পবিত্র কুরআনের বাহক মহানবী (ছাঃ) যখন ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তখন শয়তান ও বিধর্মীদের বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি তাঁকে বিব্রত করে তুলেছিল। তাঁকেও তাঁর সমর্থকদের নানা প্রকার ঠাট্টা-বিদ্রূপ, হাসি-তামাশা ইত্যাদি দ্বারা লজ্জিত ও হেয়প্রতিপন্ন

Contents

করা হ'ত। এতে তিনি খুব কষ্ট পেতেন। অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়ার এবং নিজ আদর্শে অটল থাকার জন্য তাকে তার পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের জীবন কাহিনী হুবহু তুলে ধরেন। অতঃপর সমস্ত অপরাধের জনক ইবলীস (শয়তান)-এর কুমন্ত্রণা হ'তে সাবধান থাকার উপদেশ দেন।

ইবলীসের সবচাইতে বড় কৌশল মিথ্যা, প্রতারণা ও সুন্দর সুন্দর কথাবার্তা বলা ও শিক্ষা দেয়া। এর দ্বারা সাধারণ লোককে পথভ্রষ্ট করা তো সহজ ছিল। এমনকি বড় বড় পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাও তাদের দৃষ্টিতে ঐসব কুকর্মকে শোভনীয় মনে করত। তাদের ঐসব কর্মের প্রতিফল হিসাবে তারা গযবে নিপতিত হয়েছে এবং সমূলে ধ্বংস হয়েছে। আদ ও ছামূদের মত শক্তিশালী জাতিও তাদের পাপ ও প্রতারণার হাত হ'তে রক্ষা পায়নি। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে পূর্ববর্তীদের সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

মানব সৃষ্টির পর শয়তানের আবির্ভাব হ'তেই প্রতারণার জের চলে আসছে। তবে তৎকালীন প্রতারণার রূপরেখা ছিল মোটামুটি প্রকাশ্য এবং ধর্মীয় আদর্শের পরিপন্থী। তখন জনসংখ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার প্রসার ছিল সীমিত। তবুও পৃথিবীতে কোন শান্তি ছিল না। মানুষ তখন নিজেদের অন্যায়, অপরাধ ও পাপের কারণে তাদের পালনকর্তার আদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সমূলে ধ্বংস হ'ত।

বর্তমান বিশ্বেও প্রতারণামূলক কাজের কোন কমতি নেই। তবে প্রকাশ্য অপেক্ষা গোপন প্রতারণার লড়াই অধিক জোরদারভাবে অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে জনসংখ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে শয়তানের সামর্থ্য ও দলবল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরাধ প্রবণতার সঙ্গে প্রতারণাও দিন দিন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশ বিদেশের সাম্প্রতিককালের ঘটনাবলী মানুষকে কঠিনভাবে অস্থির করে তুলেছে। শুধু অস্থিরই নয়, বিস্ময়ে হতবাক করে দিচ্ছে নিরীহ নিরাপরাধ, ধর্মপরায়ণ মানুষদেরকে। মানুষের জীবন এখন পুতুল খেলার মত ক্ষণিকের খেলা ঘরে পরিণত হয়েছে। ঘরে-বাইরে, রাস্তায়, যানবাহনে, হোটেল-রেঁস্তোরায়, সভা-সমিতি, অফিস-আদালত এমনকি উপসনালয়েও চলছে মানুষ হত্যার প্রতিযোগিতা। এত বড় বড় প্রতারণার সমাধান করতে গিয়ে বহু নিরীহ-নিরাপরাধ মানুষ বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে। পূর্ব যুগের ন্যায় এরাও যেন ঐশী ক্ষমতাকে অবিশ্বাস করে নিজেদের ইচ্ছা চরিতার্থ করছে। বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে বিশ্বে যে সব ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়েছে তন্মধ্যে গত ২০০৪ ইং সালের 'সুনামি'র সংহাররূপ বা ভয়াবহতা অন্যতম। সুনামিতে বিশ্বের পূর্বাঞ্চলে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে, বিগত ৫০ বছরেও সন্ত্রাসী বা প্রতারকরা তার এক শতাংশও ক্ষতি করতে পারেনি এবং আগামীতেও পারবে না।

প্রতারণাসহ অপরাধ জগতের সকল সমস্যার সমাধান পবিত্র কুরআন ও নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ আছে। অবশ্য বর্তমান বিশ্ব সমাজের প্রেক্ষাপটে উহার মূল্যায়ন একেবারেই অপ্রতুল। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না। তোমরা কষ্টে থাক তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাবশত বিদ্বেষ তাদের মুখে ফুটে উঠে। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে তা আরও অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হ'ল, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। দেখ! তোমরাই তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, বলে 'আমরা ঈমান এনেছি। পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়। তখন তোমাদের উপর ক্রোধবশত আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাক। আল্লাহ মনের কথা ভালই জানেন। তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়, তাহ'লে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয় তাহ'লে তাতে তারা আনন্দিত হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাক্বওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না' *(আলে ইমরান ১১৮-১২০)*।

উপরোক্ত আয়াতের আলোচনায় আল্লাহ তা'আলা প্রতারক ব্যক্তির মনোভাব ব্যক্ত করে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ঈমানদারের করণীয় সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেছেন। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে প্রতারণার অদৃশ্য রশ্মি হ'তেই অপরাধ জগতের সূত্রপাত হয়েছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে সন্ত্রাস বোমাবাজি সহ অসংখ্য অকল্পনীয় অপরাধ বিস্ফোরিত হচ্ছে দিবারাত্রি। তবে বিস্ময়ের বিষয় যে এটা এখন আর শুধু ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতারণা এখন এক মানুষের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বী অপর মানুষের পরোক্ষ দ্বন্দ্ব বা লড়াই, যা সহজে বোঝার উপায় নেই। এই অপশক্তির করাল গ্রাস হ'তে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই অব্যাহতি প্রার্থনা করে। আল্লাহ সকলকে তার নিজ নিজ ভুল বোঝার তাওফীক্ব দান করুন।- আমীন!!

Contents

ইসলাম এবং মুসলমানদের উপর স্লো পয়জনিং

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

ইসলাম এবং মুসলমানদের উপর স্লো পয়জনিং (Slow poisoning) চলছে আবহমান কাল ধরে। কিন্তু কেন? এর উৎস কোথায়? এর শুরু মানব সৃষ্টির আদি থেকেই বলতে হয়। আসমান-যমীন এবং জীবকুলের স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার কিতাব আল-কুরআনের আলোকে তা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে বলেছেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ 'আমি জিন এবং ইনসানকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫৬)*। আদি মানব আদম (আঃ)-কে প্রথম সৃষ্টি করা হয়। তাঁর সঙ্গিনী এবং স্ত্রী হিসাবে বিবি হাওয়াকে আদম (আঃ)-এর পাঁজরের হাড় থেকে আল্লাহ সৃষ্টি করেন। এই প্রথম মানব-মানবীকে জান্নাতে রাখেন। জান্নাতের সকল ফল আহারের অনুমতি দেওয়া হ'ল একমাত্র 'গন্দম' ব্যতীত।

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা আশরাফুল মাখলুক্বাত হিসাবে সৃষ্টি করেন। ফেরেশতাদের উপরে তার মর্যাদা। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আদম (আঃ)-কে সিজদা করতে আদেশ করলেন। ফেরেশতারা বিনা বাক্যব্যয়ে আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন করলেন। কিন্তু ফেরেশতাদের সর্দার ইবলীস আত্মঅহংকারে আদম (আঃ)-কে তুচ্ছ মনে করে সিজদা করেনি। ফলে নাফরমানীর কারণে সে অভিশপ্ত 'শয়তান' নামে বিতাড়িত হয়। সে আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে তার পূর্ব ইবাদতের পুণ্যফল অগ্রিম নিয়ে নিল। তার ফলে সে কিছু ক্ষমতা অর্জন করল। মানুষকে দাগা দিয়ে পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হ'ল। কিন্তু পরকালে তার জন্য জাহান্নামও বরাদ্দ হয়ে রইল।

অতঃপর দাগাবাজ শয়তান আদম (আঃ)-এর পিছু নিল। তাঁকে কুমন্ত্রণা দিয়ে কোন মতেই নিষিদ্ধ গন্দম খাওয়াতে সক্ষম হ'ল না। সে গেল বিবি হাওয়ার কাছে। তিনি শয়তানের প্ররোচনার ফাঁদে ধরা পড়লেন। তিনি নিষিদ্ধ গন্দম খেলেন। তারপর তিনি আদম (আঃ)-কেও তা খাওয়ালেন। শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞা না মেনে তাঁরা নাফরমান হয়ে জান্নাত থেকে নিক্ষিপ্ত হ'লেন পৃথিবীতে। তাঁদের জান্নাতী পোশাক খসে পড়ল। কুরআন পাকে আল্লাহ বলেছেন, 'হে বনী-আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেমন সে তোমাদের মাতা-পিতাকে জান্নাত হ'তে বের করে দিয়েছিল। এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলে দিয়েছিল, যাতে তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে ও তার দলবল তোমাদের দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তানকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না' *(আ'রাফ ২৭)*।

বাংলাদেশের জনৈক বুদ্ধিজীবি নাস্তিক্যবাদী লেখক আরজ আলী মাতুব্বরের প্রশ্ন- 'আদমের বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শয়তানেরও কি বংশবৃদ্ধি হইতেছে? না হইলে দাগা কাজ সুচারুরূপে চলে কি রকম? এর উত্তর এই দাগা কাজ পূর্ববৎ। আর শয়তানের বংশ বৃদ্ধি করে আরজ আলী মাতুব্বরেরাই। আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়া বহু বছর আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটি করে ক্ষমা প্রার্থনা করায় পরম দয়ালু আল্লাহ তাদেরকে মার্জনা করেন। আদম (আঃ)-কে নবুঅত প্রদান করেন। তাঁকে এবং বিবি হাওয়াকে দীর্ঘায়ু করে বহু সন্তান-সন্ততি জন্মদানের সুযোগ করে দেন, যাতে পৃথিবীতে দ্রুত মানব বংশবৃদ্ধি পায়। শয়তান আদম (আঃ)-এর আমলে তাঁর এক পুত্র কাবীলকে কুমন্ত্রণা দিয়ে সাগরেদ করে নিয়েছিল। নূহ (আঃ)-এর আমলে তাঁর এক পুত্র কেনানকে সাগরেদ করতে সক্ষম হয়। এভাবে যুগে যুগে শয়তান মানুষের মধ্য থেকেই সাগরেদ জুটিয়ে নেয়। তার বংশ বিস্তার হয়। এ যুগের বাংলাদেশী বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন লিখেছে- 'হাওয়া গন্দম খেয়েছে বলে সুখ, খেয়েছে বলেই সুখ, সুখ, সুখ- গন্দম খেয়ে হাওয়া পৃথিবীকে স্বর্গ করেছে। হাওয়া তুমি গন্দম পেলে কখনও না খেয়ে থেকো না'। এই যে উক্তি, এটা শয়তানের উক্তি ছাড়া আর কি? বিশ্বে এ রকম শয়তান রয়েছে প্রচুর। তাতে এখন খোদ শয়তানের পেনশন হ'লেও, বিরামহীনভাবে তার মিশন চলতেই থাকবে।

শয়তান দৃশ্যমান নয়। সে কোন প্রকার রূপ পরিগ্রহ করে মানুষের কাছে কুমন্ত্রণা দিতে আসে না। সেরূপ করার প্রয়োজনও তার নেই। সে প্রবেশ করে মানুষের কলবের মধ্যে। আর মানুষের মনে কুচিন্তার উদ্রেক হয়। এটাই হ'ল শয়তানের দাগা। অবসাদক ঔষধ কিংবা নেশাকর মদ-গাঁজা সেবনের পর মানুষ সম্বিতহারা হয়। তার ঝিম ধরে। সে আবোল-তাবোল বকতে থাকে। অসংলগ্ন কথা বলাই শুধু নয়, অপকর্মও করে ফেলে। এভাবেই শয়তান মানুষকে দাগা দিয়ে ভ্রষ্টাচারী করে। তখন মানুষ বলতে থাকে- 'Whoever has written the Koran made it absolutely clear that not a single word can be changed. I am not in favour of minor changes. It serves no purpose. The Koran should be changed thoroughly'- *Taslima Nasrin'*. 'ইসলাম হচ্ছে এক ধরনের বর্ম। পাপী ও পতিত মানুষের বর্ম। অত্যাচারী ও ব্যভিচারী মানুষের বর্ম'।-*তসলিমা নাসরিন*। 'আজান হলো বেশ্যার খদ্দের আহ্বানের মতো'।-*কবি শামসুর রহমান*। 'আল্লাহ্র ইচ্ছা যে, কিছু সংখ্যক মানুষ দোজখবাসী হোক। আর আমাকে বলেছেন তাঁর ইচ্ছা পূরণে সহায়তা করতে। এ কাজ আমার পক্ষে করা ফরজ, না করা হারাম'।-*আরজ আলী মাতুব্বর*। 'মালাউন মাইয়াগো জেনা করলে পাপ নাই, বরং

** সম্পাদক, কালান্তর, রাজাবাড়ী, পিরোজপুর।*

ছওয়াবের কাজ'। *-ড. হুমায়ুন আজাদ।* 'Religion is opinon of the people' *-Karl Marks.* 'Beware of the man whose God is in the skies' - *Bernard Shaw.* 'রবীন্দ্র সংগীতকে আমি ইবাদত মনে করি'- *কবি সুফিয়া কামাল।* আশা করি শয়তান চিনতে এবং তার কার্যপ্রণালী বুঝতে মুমিন-মুসলমানদের কোন অসুবিধা হয় না।

কুরআন পাকে সূরা নাস-এ আল্লাহ বলে দিয়েছেন, 'তুমি বল, আমি মানুষের প্রভুর আশ্রয় চাচ্ছি, যিনি মানবজাতির শাসনকর্তা, সকল মানুষের উপাস্য, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অপকারিতা হ'তে, যে মানুষের অন্তরের মধ্যে কুমন্ত্রণা দেয়, জ্বিন ও মনুষ্য জাতির মধ্য হ'তে' *(নাস ১-৬)*। কুরআন পাকে আল্লাহ মানুষকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করার জন্য সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২০৮)*।

যাদের ঈমান মযবূত শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হবে না। কেননা কুরআন পাকে বলা হয়েছে, 'ঈমানদারগণ আল্লাহ্র রাস্তায় লড়াই করে। আর কাফিররা লড়াই করে শয়তানের রাস্তায়। সুতরাং শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। নিশ্চয়ই প্রতারণায় শয়তান দুর্বল' *(নিসা ৭৬)*। শয়তানের বন্ধু কারা? এ সম্পর্কে কুরআন পাকে আল্লাহ বলেন, 'আমি অবশ্যই শয়তানদেরকে বেঈমানদের বন্ধু করেছি' *(আরাফ ২৭)*। শয়তানের কুমন্ত্রণায় যারা পরিপূর্ণভাবে আবিষ্ট হয়, তারাও শয়তানে পরিণত হয়। শয়তানের সংখ্যাবৃদ্ধি এভাবেই হয়ে আসছে। নমরূদ, ফের'আউন, হামান, কারূন, শাদ্দাদ, আবরাহা, আবু জাহেল থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ্র নাফরমান, দ্বীন ইসলামের দুশমন, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অবমাননাকারী, আল্লাহ্র পেয়ারা নবী-রাসূলগণের অবমাননাকারী, আল্লাহ্র মুমিন বান্দাদের পথভ্রষ্টকারী কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান পয়দা হচ্ছে।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ছিরাতুল মুস্তাক্বীমে চলবার জন্য আসমানী কিতাব দিয়েছেন। আল-কুরআন আল্লাহ্র সর্বশেষ এবং পূর্ণাঙ্গ আসমানী কিতাব, মানবজাতির সংবিধান, জীবন-বিধান। আল্লাহ আল-কুরআনে বলেছেন, 'আমি যাদেরকে কিতাব দিয়াছি, তারা ঐ কিতাবের উপর ঈমান আনে। আর যারা এটা মানে না, তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে' *(বাক্বারাহ ১২১)*। আল্লাহ্র কিতাব বুঝবার ব্যবস্থাও তিনিই করেছেন। কুরআন পাকে বলা হয়েছে, 'আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছি। সে তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শুনায়, তোমাদেরকে পবিত্র করে। তোমাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়, যা তোমরা পূর্বে জানতে না। অতএব আমাকে স্মরণ কর এবং আমার অনুগ্রহ স্বীকার কর। আর অকৃতজ্ঞ হয়ো না' *(বাক্বারাহ ১৫১-১৫২)*। কুরআন পাকে আরও বলা হয়েছে, 'তোমাদেরকে যা (কিতাব) দিয়েছি তা খুব শক্ত করে ধরে রাখ এবং তাতে যা আছে তা মনে রাখ, তবেই তোমরা বেঁচে যাবে' *(আ'রাফ ১৭১)*।

আল্লাহ তাঁর প্রিয় সৃষ্টি ইনসানকে নাজাতের উপায় বলে দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে হেদায়াতের ব্যবস্থা করেছেন। মানুষ যদি আল্লাহ্র কিতাবের অনুশাসন, আল্লাহ্র রাসূলের হাদীছ এবং আখলাক্ব পুরাপুরি নিষ্ঠাসহ আমল করে, শয়তান তাদের পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর ঐসব মেনে চলার মধ্যে তাদের নাজাতের ফায়ছালা রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাগণকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন কুরআন পাকে, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কর না। তারা পরস্পরের বন্ধু এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে, সে তাদেরই একজন হয়ে যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারীকে হেদায়াত করেন না' *(মায়েদাহ ৫১)*। কুরআন পাকে আরও বলা হয়েছে, 'ইহুদী ও মুশরিকদেরকে তুমি ঈমানদারগণের প্রধান দুশমন রূপে দেখতে পাবে' *(মায়েদাহ ৮২)*। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঘটনা না-ইবা উল্লেখ করলাম। ৫৭০ ঈসায়ী সালে পবিত্র মক্কা নগরীতে ইসলামের শেষ এবং আখেরী নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্ম হয়। সেকালে পৃথিবীর সকল জনপদে আল্লাহ্র নাফরমানী চলছিল। ৪০ বছর বয়সে তিনি আল্লাহ্র রাসূল হন। তারপরে শেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআনের বাণী নাযিল হ'তে থাকে। তিনি দ্বীন ইসলামের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছাতে থাকেন। প্রথমে অল্প কয়েকজন ইসলাম কবুল করেন। আরব দেশের পথভ্রষ্ট পৌত্তলিকরা মহানবী (ছাঃ)-এর আহ্বানে সাড়া দেয়নি; বরং বিভিন্নভাবে তাদের দ্বারা তিনি নির্মমভাবে অত্যাচারিত হন। নওমুসলিমরাও কাফিরদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাননি। আল্লাহ কুরআন পাকে বলেন, 'হে নবী! কাফির ও মুনাফেকগণের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার কর' *(তওবা ৭৩)*। আল্লাহ আরও বলেন, 'আর আল্লাহ্র রাস্তায় ঐ সকল লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু সীমালংঘন কর না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেন না' *(বাক্বারাহ ১৯০)*। মহানবী (ছাঃ) কখনও সীমালংঘন করেননি। নবুঅত প্রাপ্তির পর দীর্ঘ এক যুগ ধরে শত অত্যাচার সহ্য করে ধীরস্থিরভাবে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে চলেছেন। কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্র নির্দেশ পেয়ে ৬২২ ঈসায়ীতে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। মক্কার নওমুসলিমরাও ক্রমে ক্রমে মদীনায় চলে আসেন। মদীনাবাসীরাও অনেকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে সমবেত হন। আল্লাহ্র মর্জিতে এখানে কিছুটা জনশক্তি অর্জিত হ'লে মহানবী (ছাঃ)-এর নেতৃত্বে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতঃপর বিশ্বের বিভিন্ন জনপদে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছতে থাকে। লোকেরা শান্তির ধর্ম ইসলামে দাখিল

হ'তে থাকলে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি হয়। মক্কার কাফিরদের টনক নড়ে। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। বদর, ওহোদ, খন্দক, তাবুক ইত্যাদি বেশ কয়েকবার মক্কার কাফিরদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ করতে হয়েছে। সেই সকল যুদ্ধই জিহাদ নামে আখ্যায়িত। জিহাদ হ'ল আল্লাহ্‌র রাস্তায় দ্বীন ও জান রক্ষার তাকীদে যুদ্ধ। মহানবী (ছাঃ) কখনও কাফিরদের দ্বারা আক্রান্ত না হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হননি। এ যুদ্ধে যারা জান দিয়েছেন, তারাই শহীদ, তারা পবিত্র, পুণ্যাত্মা। যেকোন যুদ্ধ জিহাদ নয় এবং যেকোন যুদ্ধে নিহত হ'লেই শহীদ নামে আখ্যায়িত হয় না। আজকাল আমরাতো গোবিন্দদেবদেরকেও শহীদ নামে আখ্যায়িত করি।

আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন, 'নমরুদ, শাদ্দাদ, ফেরাউন, আবু জাহেল ইত্যাদি কাফেরদেরকে তিনি হেদায়েত করিলেন না কেন?' তার এ প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ কুরআন মাজীদে দিয়েছেন, 'আল্লাহ কাফিরদেরকে কখনও হেদায়াত করেন না' *(তওবা ৩৭)*। আরজ আলীরা অনেক কিছু জেনেও এটি জানে না। আল্লাহ কাফিরদেরকে হেদায়েত করবেন কিরূপে? তারাতো আল্লাহ্‌র আনুগত্যই স্বীকার করে না। তারা শুধু ধর্ম নিয়ে কূটতর্ক করে। আল্লাহ্‌র বিধানকে তারা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে মান্য করে না। কেন তবে হেদায়াত করবেন? বরং আল্লাহ আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন, 'এই কুরআন সমস্ত মানুষের জন্য সুসংবাদবাহক, যেন তারা এর দ্বারা সাবধান হ'তে পারে এবং জানতে পারে যে, আল্লাহ্‌ই একমাত্র উপাস্য এবং জ্ঞানীগণ যেন উপদেশ গ্রহণ করতে পারে' *(ইবরাহীম ৫২)*। শয়তানের প্ররোচনায় যারা জ্ঞানহারা, তাদের অন্তঃকরণে কখনও শুভবুদ্ধির উদয় হয় না। তাই কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের বাপ-ভাইকেও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কর না, যদি তারা ঈমানদারকে বাদ দিয়ে কাফিরকে ভালবাসে এবং তোমাদের মধ্যে যারা তাদের বন্ধু বলে জানে, অবশ্যই তারা অত্যাচারী' *(তওবা ২৩)*। অতএব আরজ আলী মাতুব্বর, আহমাদ শরীফ, ড. হুমায়ুন আজাদ, কবি শামসুর রহমান, সালমান রুশদী, কবি সুফিয়া কামাল, তসলিমা নাসরিন গং মুমিন ও মুসলমানদের কারো আপনজন নয়। তাদের গোত্রই আলাদা।

৬৩২ খৃষ্টাব্দে মহানবী (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর আরবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকুমতের খলীফা পদে মনোনীত হন তার অন্যতম ছাহাবী আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)। দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ), তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ) এবং চতুর্থ খলীফা হন আলী (রাঃ)। এই চারজন খলীফা 'খোলাফায়ে রাশেদীন' নামে প্রসিদ্ধ। এই খলীফা চতুষ্টয় দ্বীন ইসলামকে সমুন্নত রাখেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পুরোপুরি অনুসারী ছিলেন। আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর শাসনামলে কয়েক জন ভণ্ড নবীর আবির্ভাব ঘটে। তাদের মধ্যে এক খৃষ্টান মহিলাও ছিল। এরা কেউই বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। ভণ্ডদের আকাংক্ষা পণ্ড হয়ে যায়। কিন্তু কলহ-কোন্দল লেগেই থাকে। এর ফলে প্রথম খলীফার পরবর্তী তিন খলীফাই আততায়ী কর্তৃক নিহত হন।

কালক্রমে প্রজাতন্ত্রীয় ইসলামী খেলাফত সাম্রাজ্যে পরিণত হ'ল। খলীফাদের মধ্যে ইসলামী আমল-আখলাকের ঘাটতি দেখা দিল। মহানবী (ছাঃ)-এর আদর্শের প্রতি শৈথিল্য ঘটায় খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলের সঙ্গে পরবর্তী শাসনামলে বৈষম্য ছিল যথেষ্ট। ক্রমে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা কেন্দ্রীয় শাসনের বাইরে গিয়ে খেলাফতকে বহুধা বিভক্ত করে ফেলেন। মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য, মৈত্রী এবং শৌর্য-বীর্য হ্রাস পেতে থাকল। শী'আ-সুন্নী, খারেজী, মু'তাযিলা ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং মতবাদই অনৈক্যের অন্যতম কারণ। ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় খৃষ্টান নরপতিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করল। এই ক্রুসেড স্থায়ী হ'ল ১২৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৭৬ বছর। এর ফলে বহু মুসলমান মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং কিছু ভূখণ্ডও খৃষ্টানদের অধিকারে চলে যায়।

উমাইয়া বংশের খলীফা ওয়ালীদের শাসনামলে সেনাপতি মূসা স্পেন দখল করেন ৭১০ খৃষ্টাব্দে। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৭৮২ বছর মুসলমানরা স্পেন শাসন করেন। মুসলিম শাসনামলে দেশটি উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করে। খৃষ্টান রাজারা মুসলমানদের সমৃদ্ধি এবং অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে বদ্ধ পরিকর হ'ল। শেষ পর্যন্ত খৃষ্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ড দেশটি দখল করে নেয়। পরাজিত মুসলমানদেরকে প্রাণ রক্ষার আশ্বাস দিয়ে মসজিদে আশ্রয় গ্রহণের আদেশ দিয়ে সেখানে সমবেত অসংখ্য মুসলমানকে আগুনে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেদিন ছিল পহেলা এপ্রিল। আজও খৃষ্টনেরা সেই মুসলিম হত্যার নিষ্ঠুরতাকে স্মরণীয় রেখেছে April Fool (এপ্রিলের নির্বোধ) উৎসবের মাধ্যমে। আমাদের বাংলাদেশেও কোন কোন নির্বোধ মুসলমান এপ্রিলের এই নিষ্ঠুর অমর্যাদাকর উৎসবের দিনে খৃষ্টানদের মতোই তামাসায় মত্ত হয়। মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য, ঈমান ও মহানবী (ছাঃ)-এর আদর্শের অভাব ঘটায় এই পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্বব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়। এই মহাযুদ্ধে অনেক ধ্বংস এবং ভাংচুর ঘটে যায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। তুরস্কের ওছমানীয় বংশের পতনের সংগে সংগে মুসলমানদের খেলাফতেরও অবসান ঘটে। অনেক মুসলিম জনপদ খৃষ্টানদের দখলে চলে যায়। কোন মুসলিম দেশ খৃষ্টান শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। তুরস্কের মোস্তফা কামাল পাশা কম্যুনিস্ট খৃষ্টান রাষ্ট্র রাশিয়ার অনুসরণে নবীন তুরস্ক রাষ্ট্রের পত্তন করে আতাতুর্ক (তুরস্কের পিতা) হয়ে যান। মুসলমান হ'লেও তিনি তুরস্ক থেকে ইসলামকে একেবারে দেশ ছাড়া করতে উদ্যত হ'লেন। মেয়েদের পর্দা উঠিয়ে দিলেন। তুর্কী টুপী বর্জন করলেন। তুর্কী ভাষায় আযান প্রচার করতে চাইলেন। কম্যুনিষ্ট এর ছোঁয়া পেয়ে একেবারে আত্মহারা হয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটাতে শুরু করে দিলেন। যাযাবর ইহুদীরা সুযোগ পেয়ে গেল। রাশিয়া-

Contents

আমেরিকার মদদ পেয়ে এক সময়ে মুসলিম জনপদ জেরুযালেমের কিয়দংশ দখল করে ইসরাঈল নামের পরগাছা রাষ্ট্রটির পত্তন করে নিল। বিশ্বের কোথাও যাদের নিজস্ব আবাসভূমি ছিল না, তাদেরও আবাসভূমি শুধু নয়, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র তৈরী হয়ে গেল পরদেশ দখল করে। আর আজও তাদের দখলদারীত্বের খায়েশ মেটেনি। নিত্যদিন ফিলিস্তীনের মুসলমানদের রক্ত দিয়ে তারা হোলি খেলছে; কখনও বা লেবাননে প্রবেশ করে মুসলমানদের রক্তপাত ঘটাচ্ছে। মুসলমানদের প্রথম কেবলা মসজিদুল আক্বছা (বায়তুল মুকাদ্দাস) তারা দখল করে নিয়েছে। সেখানে মুসলমানদের প্রবেশাধিকার নেই। মুসলমানরা বিশ্বে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। ইহুদী-খৃষ্টানরা একত্র হয়ে সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের পালের গোদা। ইসরাঈল এসিস্ট্যান্ট-এর ভূমিকায়, যদিও ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। বিশ্বের তাবত মুসলমান সন্ত্রাসী। বিশ্বমোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ বুশ উবাচঃ তা কি আর মিথ্যে হ'তে পারে? আফগানিস্তান ও ইরাক তার করায়ত্বে। ওসামা বিন লাদেন খৃস্টজগতে চির অমর। সুতরাং মুসলমানদের আর রক্ষে নেই। সুযোগ দিলে এরা সব আল-কায়দায় যাবে। সুতরাং আবারও। সময় থাকতে মুসলমানদের মস্তক মুড়িয়ে রাখতে হয়। এ কারণেই মুসলমানদের মহানবী (ছাঃ)-এর ব্যাংগ চিত্র প্রকাশের ও কুরআন অবমাননার এই হিড়িক।

এত কথার পর, ইহুদী-খৃস্টান-মুশরিক কর্তৃক মুসলমান, মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ এবং মুসলমানদের রাসূল (ছাঃ)-এর অবমাননা এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ কেন, তা আশা করি আর রহস্যাবৃত থাকবে না। এটা তাদের অনধিকার চর্চা। যা তাদের মান্য নয়, তা নিয়ে কেন বাড়াবাড়ি করা? কিন্তু মুসলমান অন্য ধর্ম এবং তাদের ধর্মগ্রন্থ কিংবা তাদের উপাস্য সম্পর্কে কখনও বাড়াবাড়ি করে না। কেননা কুরআন পাকে আল্লাহ বলেন, 'তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে যাদের বন্দনা করেছে, তোমরা তাদেরকে মন্দ বল না, কেননা তাহ'লে তারা অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহকে অতিরিক্ত মন্দ বলে ফেলবে' *(আন'আন ১০৯)*।

আল্লাহ এবং তাঁর প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-কে যারা অবমাননা করে, কষ্ট দেয়, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, (১) 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতে ও আখেরাতে লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য তিনি অত্যন্ত কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন' *(আহযাব ৫৭)*। (২) যারা আল্লাহ এবং রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের সাজা এই যে, তাদের খুন করা হবে কিংবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা তাদের বিপরীত দিকের হাত-পা কেটে দেওয়া হবে অথবা তাদের দেশান্তর করা হবে। দুনিয়াতে হবে তাদের এই দুর্গতি, আর আখেরাতে পাবে তারা কঠিন শাস্তি' *(মায়েদাহ ৩৩)*। (৩) 'আর তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে ঠাট্টা করা হয়েছে; তখন আমি কাফিরদেরকে সময় দিয়েছি, পরে তাদেরকে গ্রেফতার করেছিলাম, তখন কিরূপ ভয়ানক হয়েছিল তাদের শাস্তি' *(রাদ ৩২)*। নমরূদ, ফের'আউন, শাদ্দাদ, কারূণ ইত্যাদি কাফিরদের শাস্তির কথা স্মর্তব্য।

ইহুদী-খৃষ্টান-মুশরিকরা মুসলমানদের চির শত্রু। এতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। কুরআন মজীদ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর বিশ্ব ইতিহাসেও তার দৃষ্টান্ত মেলে। অতএব তাদের সঙ্গে অহেতুক বিবাদ করার অবকাশ না থাকলেও তাদেরকে মিত্র ভাববার কোন যুক্তি নেই। তারা বিভিন্ন প্রলোভনের জাল বিস্তার করে অর্থাৎ শোভন কথা দিয়ে, অর্থ দিয়ে, নারী দিয়ে, গাড়ী দিয়ে, বাড়ী দিয়ে, ঋণ দিয়ে মুসলমানদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধার তালে আছে। ইহুদী-খৃষ্টানদের পরিচালিত এনজিও সেবার নামে মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের ঈমান-আখলাক বিনষ্ট করতে চাচ্ছে। নির্বোধ মুসলমানরা তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে না। এইসব কলা-কৌশল মুসলমানদেরকে দুর্বল করার পাঁয়তারা মাত্র।

এক ইহুদী নারী ক'বছর পূর্বে মুসলমানদের রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যাংগ চিত্র এঁকেছিল। ডেনমার্ক এবং সুইডেনের পত্রিকায় আবার সে রকমের ব্যাংগ চিত্র প্রকাশ করা কেন? মুসলমান এবং তাদের কিতাব ও তাদের রাসূল (ছাঃ)-কে তারা নিন্দিত করে। আবার তারাই মুসলমান নামধারী সালমান রুশদী, দাউদ হায়দার, তসলিমা নাসরিন গংকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়, পুরস্কৃত করে, মাথায় তুলে নাচে। তার কারণ কি? এতেই বোঝা যায়, তাদের উদ্দেশ্য কি?

সম্প্রতি (১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭) দৈনিক প্রথম আলোর ম্যাগাজিন আলপিন-এ মহানবী (ছাঃ)-এর ব্যাংগ কার্টুন প্রকাশ করা হয়। এই প্রকাশনার 'সাপ্তাহিক ২০০০' পত্রিকায় দাউদ হায়দারের ইসলাম বিদ্বেষী গল্প প্রকাশের অর্থ কি? অর্থ আর কিছুই নয়- একমাত্র দ্বীনদার মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত করা। তাতে যদি দেশে বিশৃংখলা, দাংগা-হাংগামা বাঁধে, তাহ'লে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিশ্বশান্তির সোল এজেন্ট জর্জ বুশ বলতে পারে যে, বাংলাদেশ একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র। এখনই একে দমন করা আবশ্যক। যেসব মুসলমান নামধারীরা মুসলমানদের ধর্ম এবং রাসূল (ছাঃ)-কে অবমাননা করে, তাদের পরামর্শদাতা কে? তাদের খুটির জোর কোথায়? মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইস মন্থরার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সারা মুসলিম বিশ্ব সফর করে তাদের কানে কী কুমন্ত্রণা দিয়ে গিয়েছিল? ইহুদী-খৃস্টান-মুশরিকরা মুসলমানকে এবং তাদের ধর্ম এবং রাসূল (ছাঃ)-কে অবমাননা করে ক্ষমা চেয়ে পার পেয়ে গেলেও, নাফরমান নরাধম মুসলমান হেন কুকর্ম করে শুধু ক্ষমা চেয়ে পার পেতে পারে না। এদের বিচার সঠিক হ'তে হবে। এদের শাস্তি কঠোর হ'তে হবে। এদেরকে আর মুসলমান বলে গ্রহণ করার যুক্তি নেই। এরা বেদ্বীন কাফির-মুশরিকদের চাইতেও নিকৃষ্ট। এরা গৃহশত্রু বিভীষণ। এদের ক্ষমা নেই।

‘জঙ্গি তৈরীর কারখানা’ থেকে ফিরে

*সঞ্জীব চৌধুরী**

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হওয়ার পর কেউ কোন হিন্দুকে ফাঁসাতে চাইলে সবচেয়ে সহজ উপায় ছিল হিন্দুটির বিরুদ্ধে ‘বেটা হিন্দুস্থানের এজেন্ট’-এই অভিযোগ আনা। কালের বিবর্তনে এই অস্ত্র এখন ভোঁতা হয়ে গেছে। সাধারণভাবে আমেরিকার নিউইয়র্কে টুইন টাওয়ারে এবং ওয়াশিংটনে পেন্টাগন ভবনে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর, বিশেষভাবে বাংলাদেশে ২০০5 সালে ৬৩টি যেলায় প্রায় একই সঙ্গে সিরিজ বোমা হামলার পর কোন মুসলমানকে ফাঁসানোর জন্য অনুরূপ একটি সহজ পথ খুলে গেছে। এখন কোন মুসলমানকে বেকায়দায় ফেলতে হ’লে তার নামের আগে ‘জঙ্গি’ তকমা জুড়ে দিলেই হয়ে গেল; বাকি ঘটনা আপনাআপনি একের পর এক ঘটতে থাকবে। যে মুসলমানকে টার্গেট করা হয় তার মুখে দাড়ি আর মাথায় টুপি থাকলে কাজটা একেবারে ‘জলবৎ তরলং’ হয়ে যায়। কওমী মাদরাসার শিক্ষকদের জন্য তো বটেই, ছাত্রদের জন্যও টুপি পরা এবং দাড়ি রাখা সুন্নাত হিসাবে বাধ্যতামূলক হওয়ায় তাদের জঙ্গি হিসাবে চিহ্নিত করাও এ রকম সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে আরো কয়েকটি দেশের মতো বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক ‘মুক্তমনা’ সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকারকর্মী শিখে ফেলেছেন যে, দাড়ি-টুপিওয়ালা মুসলমানদের জঙ্গি বলে কষে গালি দিতে পারলে বিদেশী শক্তিমানদের দরবারে সুগন্ধি তামাক দিয়ে সাজানো কল্কে পাওয়া যায়। ফলে বিরামহীন চিৎকারে দেশে-বিদেশে ঘোষণা করা হচ্ছে- বাংলাদেশ ইসলামী জঙ্গিদের প্রজনন ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে এবং কওমী মাদরাসাগুলো হচ্ছে জঙ্গি তৈরীর কারখানা। এই প্রচার মাঝে মাঝে ক্লান্তিজনিত কারণে স্তিমিত হয়, আবার নবোদ্যমে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আলেম বলে পরিচিত কিছু মুসলমান নিজেকে ‘মডারেট মুসলিম’ হিসাবে তুলে ধরার জন্য অথবা হালুয়া-রুটির ভাগ পাওয়ার জন্য অথবা নিছক শত্রুতা উদ্ধারের জন্য এ খেলায় জড়িয়ে পড়ায় ব্যাপারটি আরো জটিল হয়ে উঠেছে।

এ পটভূমিতে গত ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির নানুপুরে জামি‘আ ইসলামিয়া ওবায়দিয়া মাদরাসার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত মাহফিলে আমি আমন্ত্রিত হই। আমি সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে আমার ঘনিষ্ঠজনদের কেউ কেউ বিষণ্ন হয়ে পড়েছিল আমার নিরাপত্তার বিষয়টি ভেবে। কারণ একশ্রেণীর মিডিয়ার কল্যাণে নানুপুর মাদরাসার ‘জঙ্গিখ্যাতি’ ঢাকা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। ১৪ ফেব্রুয়ারী গোধূলিলগ্নে নানুপুর পৌঁছে দেখি চারদিক লোকে-লোকারণ্য। মাদরাসা কমপ্লেক্সের ভেতর বিশাল আঙিনা জুড়ে মাহফিল। মঞ্চে উপবিষ্ট বিভিন্ন স্থান থেকে এমনকি বিদেশ থেকেও আগত অতিথিরা। তারা একের পর এক ধর্মকথা বয়ান করছেন, শ্রোতারা শুনছেন নিবিষ্টমনে, কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নেই। জঙ্গিপনার কোন চিহ্ন নেই। আমি সেখানে গিয়েছিলাম মূলতঃ মাদরাসার মহাপরিচালক মাওলানা শাহ জমিরুদ্দীন নানুপুরীর ছেলে মাওলানা ফরীদের আমন্ত্রণে। হাসিখুশি অমায়িক ফরীদ আমার ছোট ভাইয়ের মতো।

আমাকে পেয়ে সে মহাখুশি। এমনভাবে সারাক্ষণ আমার হাত ধরে রেখেছিল যেন আমি হারিয়ে না যাই। ভিড় ঠেলে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল শাহ জমিরুদ্দীন ছাহেবের কক্ষে। সেখানে তার সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। তিনি এমনভাবে আমাকে আপন করে নিলেন যেন কতদিনের চেনা স্বজন। আমাকে একজন হিন্দু হিসাবে জেনে এবং আমার ধর্মপালন পদ্ধতি যে তার থেকে আলাদা এটা মেনে নিয়েই সেদিন তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার প্রতি সংশয়হীন বিশ্বাস ও শর্তহীন আত্মসমর্পণই হচ্ছে আমাদের অন্তরের মিলনের ভিত্তি। তিনি আন্তরিকভাবে আমার কুশল সংবাদ নিলেন, মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে আমাকে দো‘আ করলেন এবং আমার যেন কোন অসুবিধা না হয় তা দেখতে বললেন। আমার উপস্থিতি সেদিন সেখানে মোটামুটি আলোড়ন তুলেছিল। অনেকেই আমার সঙ্গে দেখা করার এবং কথা বলার জন্য আগ্রহী ছিলেন। এভাবে দফায় দফায় আলাপ করতে গিয়ে রাত ২-টা বেজে গিয়েছিল।

পরদিন ভোরে ব্যক্তিগত কাজে চট্টগ্রাম শহরে গিয়ে তন্ময়ের সঙ্গে দেখা। সে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার শেষ বর্ষের ছাত্র এবং আমার দেশ-এর শিক্ষা পাতার কন্ট্রিবিউটর। আমাকে হাতের কাছে পেয়ে ও নানুপুর মাদরাসার ‘জঙ্গিরা’ কেটে ফেলেনি দেখে সেও উৎসাহী হ’ল আমার সঙ্গে মাহফিলে যেতে। সেদিন জুম‘আর ছালাতের পর মাহফিল শেষ হয়। সেদিনই নানুপুরে মাদরাসার আশপাশে বেড়াতে যাই। মাদরাসার একেবারে লাগোয়া হচ্ছে একটি বৌদ্ধ বিহার। এটা ফটিকছড়ি থানার সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ মন্দির। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল ধরে মাদরাসা আর বৌদ্ধ বিহার পাশাপাশি অবস্থান করছে। কখনো কোন রকম অশান্তি হয়নি। বৌদ্ধ মন্দির ছাড়াও মাদরাসা সংলগ্ন গ্রামটি বৌদ্ধপ্রধান। খানিকটা দূরে ছোট একটি হিন্দু পল্লী আছে। সেখানকার বাসিন্দারা মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাদের কথা ফটিকছড়ির বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাসীদের

* *সাংবাদিক ও কলামিষ্ট।*

দৌরাত্ম্য থাকলেও এ মাদরাসার কারণে নানুপুর অনেকটা সন্ত্রাসমুক্ত। সেখানকার আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি আমাকে মুগ্ধ করেছে। সেখানে সুবর্ণজয়ন্তীর মাহফিল উপলক্ষে যে মেলা বসে তাতে বেশ কয়েকজন হিন্দু ও বৌদ্ধ দোকানির দেখা পেয়েছিলাম। সবাই মিলেমিশে আছে, শান্তিতে আছে। আমার মনে একটা প্রশ্ন খচখচ করছিল; জঙ্গি তৈরীর কারখানা হিসাবে নিন্দিত এই কওমী মাদরাসার পরিবর্তে সেখানে যদি একটা আধুনিক কলেজ গড়ে উঠত তবে কি হিন্দু ও বৌদ্ধ পাড়ার বৌ-ঝিরা এখনকার মতো নিরাপদ থাকতে পারত?

আমি শুনে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়েছি যে, এহেন ঐতিহ্যবাহী মাদরাসার বিরুদ্ধেও একের পর এক ষড়যন্ত্র চলে আসছে। অন্যত্র যেমন হয়, এখানেও ষড়যন্ত্রকারীরা ব্যবহার করছে 'জঙ্গি অস্ত্র'। একশ্রেণীর মিডিয়াকে ব্যবহার করে এ মাদরাসার বিরুদ্ধে দিনের পর দিন অপপ্রচার চালানোর পাশাপাশি অস্ত্র মামলাসহ নানা ধরনের মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে দায়িত্বশীলদেরকে। এসব ষড়যন্ত্রে আলেম নামধারী গুটিকয়েক লোক জড়িত থাকায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এদের সঙ্গে আবার রাষ্ট্রযন্ত্রের শক্তিশালী অংশের মাখামাখির কথাও শোনা যায়। ইদানীং তাদের নতুন অস্ত্র হয়েছে মুফতি হান্নানের জবানবন্দি'। মুফতি হান্নান এখন জেলে। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সন্ত্রাসী তৎপরতা ও ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্মে নেতৃত্ব দেয়ার জোরালো অভিযোগ আছে। তার জবানবন্দি হিসাবে পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে যেসব কথা ছাপা হয়েছে সেগুলো একত্রে যোগ করলে আকারে মহাভারতকেও হার মানাবে। কিন্তু রহস্যজনক কারণে তাকে আসামি করে কোন মামলায় এখনো চার্জশিট দেয়া হচ্ছে না। বরং 'মুফতি হান্নানের জবানবন্দিতে নাম আছে' একথা বলে মাঝে মধ্যেই 'জঙ্গি' ধরা হচ্ছে এবং তাদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এই 'জঙ্গি জঙ্গি' খেলা কবে শেষ হবে আমি জানি না। তবে এ ধরনের খেলাকে যে আইনের শাসন বলা যায় না একথা বিলক্ষণ বুঝি।

[সংকলিত ও ঈষৎ সংক্ষেপায়িত]

Contents

অর্থনীতির পাতা

সূদের অভিশাপঃ পরিত্রাণের উপায়

*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

ভূমিকাঃ

সমাজ শোষণের যতগুলো উপায় এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয়েছে, ধনীকে আরও ধনী এবং গরীবকে আরও গরীব করার যত কৌশল প্রয়োগ হয়েছে সূদ সেগুলোর মধ্যে সেরা। কৌশল, পদ্ধতি, ফলাফল, অর্থনীতির চূড়ান্ত অনিষ্ট সাধন সকল বিচারেই সূদের কাছাকাছি কোন সমাজবিধ্বংসী হাতিয়ার নেই। সেই প্লেটো-এরিস্টটলের যুগ হ'তেই সূদ অপ্রতিহত গতিতে সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, সূদকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে, সূদখোরদের সামাজিক শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সূদ বর্জনেরও আহ্বান জানানো হয়েছে যুগে যুগে। কোন আসমানী গ্রন্থেই সূদের লেনদেনকে সমর্থন করা হয়নি, বৈধতা দেওয়াও হয়নি।

ইতিহাসের কাল পরিক্রমায় দেখা যায়, অন্যের দুর্ভাগ্য হ'তে অর্থ উপার্জনের জন্য সূদখোরদের নিন্দা করা হয়েছে। প্লুটার্ক বিশ্বাস করতেন- বিদেশী আক্রমণকারীদের চাইতে সূদখোররা অধিকতর নির্যাতনকারী। মধ্যযুগের গীর্জা অপরিসীম লোভ ও কৃপণতার জন্য সূদখোরদের দেহপসারিণীদের সমতুল্য গণ্য করেছে। ইতালীর অমর কবি দান্তে সূদখোরদের নরকের অগ্নিবৃষ্টিময় সপ্তম বৃত্তে নিক্ষেপ করেছেন। সূদখোররা তাদের প্রবাদতুল্য অর্থগৃধ্নুতা, নিষ্ঠুরতা ও লোলুপতার জন্য সেক্সপীয়ার, মলিয়ের প্রমুখ বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনায় বিদ্রূপের খোরাক হয়ে রয়েছে। সূদখোররা কদাচিৎ সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছে। ঋণ প্রদানের একচেটিয়া ব্যবসা, ক্ষুদ্র ও স্বল্প মেয়াদী ঋণের জন্য চড়া হারে সূদ আদায় এবং ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে ঋণগ্রহীতার সবর্স্ব খুইয়ে বসার কারণেই সূদখোরদের বিরুদ্ধে এই সার্বজনীন নিন্দা উৎসারিত হয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতির জন্য প্রেরিত তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থে সূদকে হারাম ঘোষণা করেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। মানবতার শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিটিও তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে সূদকে চিরতরে নিষিদ্ধ ও রহিত ঘোষণা করেছিলেন। সে ঘোষণায় ফলও হয়েছিল। আব্বাসীয় ও উমাইয়া যুগের শেষ দিন পর্যন্তও ইসলামী হুকুমাতের কোথাও সূদ বিদ্যমান ছিল না।

পরবর্তীতে মুসলমানদের ভোগবিলাস ও আত্মবিস্মৃতির সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের পরাভূত করে ধ্বংস করে দেয় তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণের উপর আধিপত্য বিস্তার করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ। বিপরীতে মুসলিম দেশ ও সমাজ প্রতিরোধ তো গড়তে পারেইনি; বরং ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ে যোজন যোজন পথ। এই সময়েই ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পথ ধরে নতুন আঙ্গিকে সূদ পুনরায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে। ব্যাংকিং পদ্ধতির বিকাশ ঘটে শিল্প বিপ্লবের হাত ধরেই। ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমেই সমাজে সূদের সর্বনাশা শোষণ ও ধ্বংস আরও গভীর ব্যাপ্তি লাভ করে। একদিকে পুঁজি আবর্তিত হ'তে থাকে শুধু ধনীদের মধ্যেই, যা আল-কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে সূদের কারণে আরও নতুন নতুন অর্থনৈতিক নির্যাতন ও শোষণ বিস্তৃতি লাভ করে সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে যার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ সহজসাধ্য নয়।

সূদের কুফলঃ

সূদের কুফল বহুবিধ। এসব কুফল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করতে হ'লে পৃথক প্রবন্ধের প্রয়োজন। এখানে শুধু কুফলগুলি উল্লেখ করা হ'লঃ

১. সূদ সমাজ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম।
২. সূদের কারণে দরিদ্র আরও দরিদ্র এবং ধনী আরও ধনী হয়।
৩. সূদের শোষণ সার্বিক, ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির।
৪. সূদ গ্রহীতারা প্রায়শই স্বার্থপর, কৃপণ ও চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়।
৫. সূদের নিশ্চিত উপার্জন সূদখোরকে শ্রমবিমুখ ও অলস করে।
৬. সূদের ফলে একচেটিয়া কারবারের প্রসার ঘটে।
৭. সূদের কারণে মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই বৃহৎ পুঁজি আবর্তিত হয়।
৮. সূদ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ।
৯. সূদের দীর্ঘমেয়াদী কুফল স্বরূপ অর্থনীতিতে মন্দার সৃষ্টি হয়।
১০. সূদ পূর্ণ কর্মসংস্থানেরও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক।
১১. সূদের জন্যই দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হয়।
১২. সূদ স্বল্প লাভজনক সামাজিক প্রয়োজনীয় খাতে বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে।
১৩. সূদের কারণেই ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প লাভজনক হ'তে পারে না।
১৪. সূদ সাধারণ জনগণের বিত্ত স্বল্প সংখ্যক পুঁজিপতির হাতে পুঞ্জীভূত করে।
১৫. সূদ সৃজনশীল উদ্যোগের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
১৬. সূদ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে।
১৭. সূদ মজুরী বৃদ্ধির অন্যতম প্রতিবন্ধক।
১৮. সূদ ধনবন্টনে অসমতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ।
১৯. সূদ মুদ্রাস্ফীতিতে প্রত্যক্ষ ইন্ধন যোগায়।
২০. সূদের কারণেই ধনী ও দরিদ্র দেশের সম্পর্ক শোষক-শোষিতের পর্যায়ে উপনীত হয়।

* *প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

Contents

এসব ছাড়াও সূদের নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক কুফল রয়েছে। সেগুলি আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তাই সেসবের উল্লেখ হ'তে বিরত থাকা হ'ল।

পরিত্রাণের উপায়ঃ

সূদের এই সর্বগ্রাসী সয়লাব, এর ভয়াবহ বিধ্বংসী কুফলসমূহ হ'তে উদ্ধার লাভের উপায় কি? পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী খিলাফতের দীর্ঘ নয়শত বছরে মুসলিম বিশ্বে কোথাও সূদ বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের পতনদশা শুরু হ'লে যখন পাশ্চাত্যের ধনবাদী আগ্রাসী শক্তিসমূহ একে একে মুসলিম দেশসমূহ গ্রাস করতে শুরু করে, তখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয় চরম নাজুক অবস্থা। ব্যবসা-বাণিজ্য, ভূ-সম্পত্তি সবই চলে যায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের দখলে। এই সময়েই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সূদের বিস্তার শুরু হয়। দীর্ঘদিন পরে যখন এসব দেশ পুনরায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে ততদিনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সূদ গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে। সূদ উচ্ছেদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কোন প্রচেষ্টাও চলেনি। অর্থবহ কোন জোরদার কর্মসূচীও গৃহীত হয়নি। সূদ উচ্ছেদের জন্য মাত্র বিগত শতাব্দীর শেষভাগে ইসলামী পদ্ধতির ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এরপরও বাংলাদেশের মত বহু মুসলিম দেশে সূদ অর্থনৈতিক-সামাজিক-প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে সদাপটে বিরাজমান। কিভাবে একে সমাজদেহ হ'তে উচ্ছেদ করা যায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হ'তে কিভাবে চিরতরে দূর করা যায়, এক কথায় সূদ বর্জনের কৌশল কি হ'তে পারে সে সম্বন্ধেই এখানে কিছু কর্মসূচী আলোচিত হ'ল।

সামাজিক কর্মসূচীঃ

১. গণসচেতনতা সৃষ্টিঃ সূদ বর্জনের তথা সমাজ হ'তে সূদ উচ্ছেদের জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টির বিকল্প নেই। এদেশের জনগণের প্রায় ৮৫% লোক মুসলমান। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু যথার্থ ইসলামী জ্ঞানের অভাবে সূদ যে ইসলামে সর্বৈব হারাম সে সম্বন্ধে অনেকেই জ্ঞাত নয়। কেউ কেউ বলেন, ঐ নির্দেশ চৌদ্দশত বছর আগে ঠিক ছিল, এখন নয় (নাঊযুবিল্লাহ)। তাদের যুক্তি, ব্যাংকের সূদ ও ব্যক্তির দাবীকৃত সূদ একই পর্যায়ের বিবেচিত হ'তে পারে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভবই হয়নি। আবার একদল বলেন, আরবী রিবা এবং ইংরেজী Interest একই অর্থ বহন করে না। অথচ আভিধানিক ও ব্যবহারিক বিচারে রিবার যে অর্থ ইংরেজী Interest -এর ব্যবহারিক অর্থ একই দাঁড়ায়। আল-কুরআনে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সূদকে করেছেন হারাম' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। দেশের সাধারণ জনগণের বিপুল অংশ প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআনের এই নির্দেশ সম্বন্ধে অবগত নয়। এজন্যই তাদের কাছে এই ইলাহী নির্দেশ যথাযথ গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা অতীব প্রয়োজন। সূদের ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে প্রথমেই যে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা দরকার তা হ'ল সূদের আয় যেমন হারাম, সূদের সঙ্গে যেকোন ধরনের সংশ্লিষ্টতাও তেমনি হারাম এবং হারাম সূত্রে উপার্জন ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা সূদ খায়, সূদ দেয়, সূদের হিসাব লেখে এবং সূদের সাক্ষ্য দেয় সকলের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত'।[১] ছহীহ হাদীছ অনুসারে আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ কবুল হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো রয়েছে তার অন্যতম হ'ল হালাল রিযিকের উপর বহাল থাকা।[২] সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যদি আমাদের উপার্জনই হালাল না হয় তাহ'লে আল্লাহ্‌র দরবারে যতই ফরিয়াদ করি না কেন তা কবুল হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই।

সেক্ষেত্রে আমাদের সকল ইবাদত বন্দেগীই বরবাদ হয়ে যাবে। এর চূড়ান্ত পরিণতি হ'ল আখিরাতে আল্লাহ্‌র আযাব হ'তে রেহাই না পাওয়া। তাই ঈমান বজায় রাখার স্বার্থেই আমাদের হালাল রূযী অর্জনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং যা হারাম তা পরিত্যাগের সর্বাত্মক উদ্যোগ নিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে হালাল অর্জন ও হারাম বর্জনের মধ্যেই রয়েছে মুমিন জীবনের যথার্থ সাফল্য। এই সাফল্য অর্জনের জন্য চাই নিরন্তর নিরলস প্রয়াস।

ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই কেবল সূদ উচ্ছেদের লক্ষ্য অর্জিত হ'তে পারে। জনগণের চাহিদা এবং তার দৃঢ় বহিঃপ্রকাশ ছাড়া সরকার নিজ থেকে খুব কমই তাদের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে থাকে। তাই সূদ উচ্ছেদের কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে এক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। এজন্য সবার আগে চাই গণসচেতনতা। আমাদের দেশের জনগণের একটা অংশ এখনও শিক্ষিত নয়। তাই কাজটা একটু কঠিন ও আয়াসসাধ্য, তবে অসম্ভব নয়। কারণ এদেশের জনগণ ধর্মভীরু। তাদের যদি যথাযথভাবে ইসলামের দাবী কি এবং তা অর্জনের উপায় কি এটা বোঝানো যায়, প্রকৃতই উদ্বুদ্ধ করা যায়, তাহ'লে এদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামোয় সূদ বর্জন সময়সাপেক্ষ হ'তে পারে কিন্তু অসম্ভব নয়। এজন্য কতকগুলি উপায় অনুসরণ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ মসজিদে জুম'আর খুৎবার সাহায্য গ্রহণ। বছরে বায়ান্ন দিন এলাকার জনগণ মসজিদে জুম'আর ছালাতে শামিল হন। এই ছালাতের খুৎবায় নানা বিষয়ের অবতারণা করা হয়। সেসব বিষয়ের পাশাপাশি যদি খতীব বা ইমাম ছাহেব সূদী অর্থনীতির কুফল এবং দেশ ও জাতির জন্য কতখানি ক্ষতিকর তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলেন, তাহ'লে ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

দ্বিতীয়তঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়ায মাহফিল, তাফসীর মাহফিল ও ইসলামী জালসায় ওলামায়ে কেরাম ও মুফাসসিরে কুরআনগণ বক্তৃতা করে থাকেন। সেখানে হাযার হাযার লোকের সমাগম হয়। ঐসব অনুষ্ঠানে যদি ইসলামী অর্থনীতির কল্যাণময় দিক এবং সূদী অর্থনীতির

১. *মুসলিম, হা/১৫৯৮; তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত হা/২৮০৭।*
২. *মুসলিম, হা/১০১৫।*

কুফল সম্বন্ধে বিশদভাবে বুঝিয়ে বক্তব্য রাখা যায় তাহ'লে যে আলোড়ন সৃষ্টি হবে, জনমত গড়ে উঠবে তার ধাক্কাতেই সূদী অর্থনীতি উৎখাত হ'তে পারে, বাস্তবায়িত হ'তে পারে ইসলামী অর্থনীতি।

তৃতীয়তঃ দেওয়াল লিখন ও পোস্টারিং। সূদের অপকার সম্বন্ধে আমজনতাকে ওয়াকিফহাল তথা সচেতন করে তুলতে হ'লে দেওয়াল লিখন ও পোস্টারিং একটা মোক্ষম উপায়। এর মাধ্যমে সহজেই সূদের ভয়াবহ কুফল ও হালাল রূযীর অপরিহার্যতা সম্বন্ধে মোটা দাগে প্রয়োজনীয় কথাগুলো সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা যায়। সুন্দর ডিজাইনে বড় বড় হরফে ছাপা পোস্টার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। একইভাবে দেওয়াল লিখনের চমৎকার শ্লোগানগুলো দাগ কেটে বসবে লোকের মনে। পৃথিবীর সকল দেশেই বিশেষতঃ উন্নয়নশীল দেশসমূহে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলি ছাড়াও খোদ সরকারই এই পদ্ধতির আশ্রয় নিচ্ছে। ফলও পাচ্ছে হাতে হাতে।

চতুর্থতঃ রেডিও-টিভিতে নাটিকা, কথিকা ও আলোচনা অনুষ্ঠান ও টকশো প্রচলনের ব্যবস্থা গ্রহণ। বর্তমানে টেলিভিশনের প্রভাব বিপুল হ'লেও রেডিওর কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা শেষ হয়ে যায়নি। সূদের শোষণ ও নানাবিধ কুফল সম্পর্কে নাটিকা প্রচারিত হ'তে পারে রেডিও এবং টিভি থেকে। বাংলাদেশে এখন অনেক বেসরকারী রেডিও ও টিভি চ্যানেল রয়েছে। ইসলামী আদর্শ অনুসারী অনেক প্রোগ্রামও প্রচারিত হয় এসব গণমাধ্যম হ'তে। সেসব প্রোগ্রামেরই অন্তর্ভুক্ত করা যায় এ ধরনের অনুষ্ঠান। এর মাধ্যমে অগণিত দর্শকশ্রোতার কাছে উপভোগ্যভাবে হারাম উপার্জন ও তার ভয়াবহ পরিণামের কথা তুলে ধরা যেতে পারে। সূদের অপকার সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা হ'তে পারে। টকশোর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রাঞ্জলভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করলে অজস্র মানুষ এ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারতো, উপকৃত হ'তে পারতো। তাদের চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হ'ত। পরিণামে সূদ পরিত্যাগের জন্য তাদের অনেকেই যে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ নিত নিঃসন্দেহে সে আশা করা যায়।

পঞ্চমতঃ পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ ও উপসম্পাদকীয় প্রকাশ। দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায় সূদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিকতা বিধ্বংসী প্রসঙ্গসমূহ নিয়ে পরিকল্পিতভাবে নিয়মিত বিশদ আলোচনা প্রকাশিত হ'তে থাকলে তা যেমন গণসচেতনতা সৃষ্টি করবে তেমনি গণজাগরণেরও আবহ তৈরী হবে। একই উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে, দেশের কর্ণধারদের সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে উপসম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হ'তে পারে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে দৈনিক ইত্তেফাকের 'রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ' এই ধরনের ভূমিকাই রেখেছিল। দেশে এখন ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। সেসব দৈনিক এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসলে তা হবে প্রশংসনীয় এক বিরাট খিদমত।

২. **আখিরাতে জবাবদিহিতাঃ** মুসলমানদের জীবনে রয়েছে দু'টি পর্ব- ইহকাল ও পরকাল বা আখিরাত। পরকালের জীবনটাই অনন্ত, ইহকালের জীবন ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর। পরকালের জীবনে রয়েছে অপরিমেয় পুরস্কার অথবা কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ নির্দেশিত পথে ইহকালে জীবন যাপন করলে যেমন আখিরাতে রয়েছে আনন্দময় জীবন, তেমনি সেই নির্দেশের পরিপন্থী জীবন যাপনের জন্য রয়েছে অনন্ত দুঃখভোগ। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, অনন্ত কাল জাহান্নামে সেই দুঃখভোগ চলতে থাকবে এবং জাহান্নাম নিঃসন্দেহে নিকৃষ্টতম স্থান *(তাগাবুন ১০)*। যেসব কারণে আখিরাতে বনী আদমকে ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হ'তে হবে, তার অন্যতম হ'ল হারাম পন্থায় উপার্জন ও হারাম বস্তু ভোগ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, হারাম খাদ্য হ'তে শরীরে যে রক্তমাংস সৃষ্টি হয় তা জাহান্নামের আগুনের খোরাক হবে।[৩] হারাম খাদ্য শুধু হারাম বস্তু হ'তেই তৈরী হয় না, হারাম উপার্জন হ'তে সংগৃহীত খাদ্যও হারাম বলেই গণ্য হবে। সূদ-ঘুষ, চুরি-দুর্নীতি, টেন্ডারবাজি, জালিয়াতি, ওযনে কম দেওয়া, ভেজাল দেওয়া, নকল করা, জুয়া, ফটকাবাজারী, প্রতারণা প্রভৃতি সবই ইসলামে হারাম। এসব হারাম পন্থায় উপার্জন করা বা বিত্তবান হওয়া যেমন হারাম তেমনি ঐ উপার্জন বা বিত্ত-সম্পদ ভোগ বা ব্যবহার করাও হারাম। পূর্বেই বলা হয়েছে হালাল রূযী দো'আ কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হারাম উপার্জন আখিরাতে আমাদের কোন কাজে তো আসবেই না, উল্টো এর পরিণামফল হবে ভয়াবহ। এজন্যই অন্যান্য সব হারাম উপার্জনের মতো সূদও অবশ্যই বর্জন করতে হবে। সূদ খাওয়ার পাশাপাশি সূদের হিসাব লিখে ও সাক্ষ্য দিয়েও উপার্জন করা সম্ভব। এই পথও বন্ধ করতে হবে। অর্থাৎ কোন প্রকারেই সূদের সাথে কোন সংস্রব রাখা চলবে না। তা না হ'লে এই আয়ের জন্য, এই আয়ে জীবন ধারণের জন্য আখিরাতে ভয়াবহ ও ভীতিকর শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। জনগণের মধ্যে এই চেতনা, এই বোধ জাগিয়ে তোলা অতীব যরূরী।

এ দেশের আমজনতার মধ্যে ইসলামপ্রীতি ঈর্ষণীয়। কিন্তু এদের বিপুল অংশই ইসলামের মূল যে দাবী আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকারের অনুসরণের মাধ্যমেই যে আল্লাহর ইবাদত বা তাঁর বন্দেগী হয়, সে সম্বন্ধে প্রায় অনবহিত বললে অত্যুক্তি হবে না। এমন অজস্র লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে যারা ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস শুধু এগুলো পালন করলেই একজন মুসলমান হিসাবে আল্লাহর কাছে স্বীকৃত হবে এবং আখিরাতে

---

৩. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/২৭৮৭।*

নাজাত পেয়ে যাবে। আয়-রোযগার, ব্যয়, ভোগ, বিনিয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ কি সে সম্বন্ধে না তারা জানার চেষ্টা করেছে, না সেসব আমলের ব্যাপারে সতর্ক হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করাই হ'ল অত্যাবশ্যক কাজ।

হালাল রূযী উপার্জনের ব্যাপারে, হালাল আহার ও হালাল সামগ্রী ভোগের ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, এমনকি ইমামগণ কতদূর সতর্ক ছিলেন সে খবর আমরা কতজন রাখি? অথচ সেইসব উদাহরণই হওয়া উচিৎ ছিল আমাদের পালনীয় আদর্শ। বহু লোক আখিরাতকে ভয় করলেও আখিরাতের জবাবদিহিতা সম্পর্কে হয় অনবহিত, নয়তো গাফেল বা অসতর্ক। বর্তমানের প্রয়োজনের অজুহাতে অথবা শয়তানের কৌশলী প্রতারণা বা প্ররোচণায় বশীভূত হয়ে তারা দুনিয়া তথা এর সম্পদ ও ভোগবিলাস অর্জনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। ফলে হালাল-হারামের বাছ-বিচার তার কাছে গৌণ বা তাচ্ছিল্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ভ্রান্তি এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, সূদের কারবার করে, সূদের লেনদেন করে, সূদী উপার্জনের অর্থেই এই উদ্দেশ্যে হজ্জ করতে যায় যে, হজ্জের কারণে আল্লাহ তা'আলা তার সমুদয় গুনাহ মাফ করে দেবেন। অথচ ছহীহ হাদীছের মর্মার্থ এর বিপরীতটাই।

৩. **পাঠ্যসূচীতে ইসলামী অর্থনীতি চালু করাঃ** বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু জনগণের তথা মুসলমান জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এই যে, স্কুল-কলেজের শিক্ষার বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাদের ঈমান ও আক্বীদার কোন সংশ্রব নেই। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত ইসলামী শিক্ষার কথা বাদ দিলে উচ্চতর শিক্ষা এবং বিশেষ শিক্ষার কোন পর্যায়েই ইসলাম যে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তা জানার ও অনুশীলনের কোন সুযোগ নেই। এই অবস্থার নিরসন হওয়া দরকার। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচীতে দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ঈমান-আক্বীদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হ'তে হবে। এজন্য প্রয়োজন গোটা পাঠ্যসূচীর সংস্কার। যারা আগামী দিনে এদেশের প্রশাসন, বিচার, আইন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কল-কারখানার কর্ণধার হবে, তাদের যদি এখনই সূদী অর্থনীতির কুফল ও ধ্বংসাত্মক দিক সম্বন্ধে অবহিত করা না যায় এবং পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতির গঠনমূলক ও হিতকর দিকগুলো জানানো না যায়, তাহ'লে জাতি যে তিমিরে রয়েছে সেই তিমিরেই থেকে যাবে।

কিশোর বয়সেই যা শেখা যায়, যে বিষয়গুলো স্কুলের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত থাকে সারা জীবন তার প্রভাব রয়ে যায় মানুষের চিন্তা, চেতনা ও কর্মধারার উপর। কখনো সচেতনভাবে কখনো অবচেতন মনে। সেজন্যই বিভিন্ন মতাদর্শের স্কুলের পাঠ্যসূচীর বিষয়সমূহ নির্বাচন করা হয় যথেষ্ট সতর্কতার সাথে, প্রচুর যাচাই-বাছাই ও চিন্তা-ভাবনার পর। জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য, মানবিক মূল্যবোধ, কল্যাণময় জীবন, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ সমাজ গঠনের জন্য যেসব মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য সেসব বিষয়ই স্কুলের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর স্কুল পাঠ্যসূচী বা যেসব সিলেবাস অনুসরণ করা হয় সেগুলি একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এই সত্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। আমাদের দেশেও বিগত দশকগুলিতে স্কুলের পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। দেশের মুক্তি সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী, বীর শ্রেষ্ঠদের জীবনগাথা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল, এমনকি একেবারে সাম্প্রতিক কালে এইডসের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কেও আলোচনা বাধ্যতামূলকভাবে ঠাঁই পেয়েছে স্কুলের পাঠ্যসূচীতে।

অথচ গভীর পরিতাপের বিষয়, ইসলামী জীবনাদর্শ, আচরণ, ইসলামী শিক্ষা, অমর মুসলিম মনীষীদের জীবনকাহিনী এই পাঠ্যসূচীতে গুরুত্বের সাথে ঠাঁই করে নিতে পারেনি। ফলে লক্ষ লক্ষ শিশু, কিশোর-কিশোরীর ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট হয়ে গড়ে ওঠার কোন সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে এদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও বামপন্থী বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিকড়হীন জনসমর্থনহীন বাকসর্বস্ব মুষ্টিমেয় এইসব বুদ্ধিজীবির সুকৌশলী পদক্ষেপ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীতে যেন কোনক্রমেই ইসলামী জীবনাচরণ সম্পর্কে জানার ও শেখার সুযোগ না থাকে সেজন্য এরা প্রায়শই সেক্যুলার পাঠ্যসূচীর যৌক্তিকতা, বিজ্ঞানমনস্ক পাঠ্যসূচীর অপরিহার্যতা ইত্যাকার চটকদার ব্যানারে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম-ওয়ার্কসপের আয়োজন করে গৃহীত সুপারিশসমূহ জাতীয় দাবী শিরোনামে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে পেশ করে। একই সঙ্গে তাদের ঘরানার পত্রিকাগুলোও জোর সমর্থন দিয়ে যায়। ফলে সরকারের নীতি নির্ধারকরাও বিভ্রান্ত বা বিচলিত না হয়ে পারে না।

অথচ দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ঈমান-আক্বীদার সাথে সম্পর্কিত বিষয় স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ ছিল। ইসলামী জীবনাচরণ, হালাল উপার্জনের অপরিহার্যতা, যাকাতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুফল, সূদের অবশ্যম্ভাবী ক্ষতিকর প্রসঙ্গ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা খুবই যরূরী।

৪. **সামাজিক প্রতিরোধ সৃষ্টিঃ** সূদের মতো ভয়াবহ এক অক্টোপাসের নাগপাশ হ'তে মুক্তি লাভ করতে প্রয়োজন মযবূত সামাজিক প্রতিরোধ। যথাযথ সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলে বহু অন্যায়-অপকর্ম ও অসামাজিক কাজ হ'তে জনগণকে বিরত রাখা যায়। বিপরীতক্রমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে, সামাজিকভাবে সচেতন করতে পারলে বহু কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। এদেশে বনায়ন কর্মসূচী তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ। বছর ত্রিশেক পূর্বে দেশের অনেক এলাকায় মরুকরণের লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। সেই সময়ে বৃক্ষরোপণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে জনমত তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়। রেডিও-টেলিভিশন

সংবাদপত্র প্রভৃতি গণমাধ্যমে নানা অনুষ্ঠান প্রচার ছাড়াও স্কুল-কলেজ মক্তব-মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদের এই কাজে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গৃহীত হয়। একাজের সামাজিক স্বীকৃতি স্বরূপ শহর, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আজ তার সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

সূদ উচ্ছেদের জন্যে এ ধরনের জনমত গঠনের পদক্ষেপ নিতে হবে। এক সময়ে এদেশের সমাজে সূদ বিরোধী মনোভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আজ সমাজে সূদখোরদের দাপট চোখে পড়ার মতো। গ্রামাঞ্চলে সূদখোররা মহাজন নামে পরিচিত। সূদী ব্যবসার কারণে সমাজপতিদের মধ্যেও তারা আসন করে নিয়েছে। শহরেও সূদের লেনদেনকারী ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিরা সকল কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। সূদকে আজ আর ঘৃণার চোখে দেখা হচ্ছে না। সুতরাং এর প্রতিবিধানের চেষ্টা না করলে এই সর্বনাশা পাপ ও সমাজবিধ্বংসী বিষ আরও ভয়াবহ রূপ নেবে। এজন্যেই প্রয়োজন সামাজিক প্রতিরোধ সৃষ্টি। এই প্রতিরোধ যতই ব্যাপক ও দুর্বার হবে সূদের নিষ্পেষণ ততই আলগা হ'তে বাধ্য। ক্রমে এক সময়ে তা খসে পড়বে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হ'ল।

১. সূদখোরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ। সমাজে যারা সূদখোর বলে পরিচিত, তাদের পরিচিতি যাই হোক না কেন ধীরে ধীরে তাদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে হবে। তারা যেন বুঝতে পারে যে সূদের সঙ্গে সংশ্রব থাকার কারণেই জনগণ তাদের সঙ্গ বর্জন করছে বা তাদের এড়িয়ে চলছে। কাজটা কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু সকলে মিলে এগিয়ে এলে মোটেই দুঃসাধ্য নয়।

২. সূদখোরদের জনপ্রতিনিধি না বানানো। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কোন কাজে সূদখোরদের নির্বাচিত হ'তে দেওয়া হবে না। তারা ভোটপ্রার্থী হ'লে যেন ভোট না দেওয়া হয় সেজন্য জোর প্রচারণা চালাতে হবে। জনগণকে বুঝাতে হবে এইসব লোকের কার্যক্রমের জন্যই সমাজে শোষণ-নির্যাতন-নিপীড়ন জগদ্দল পাথরের মতো চেঁপে থাকবে।

৩. সূদখোরদের সামাজিকভাবে বয়কট করা। যারা সূদের ব্যবসা করে, গ্রামে মহাজনী কারবারের (গ্রামাঞ্চলে সূদী ব্যবসার প্রচলিত নাম) সাথে যারা যুক্ত তাদের ছেলে-মেয়ের বিয়ে না দেওয়া এবং তাদের জানাযা না পড়ানোও উত্তম প্রতিষেধকের কাজ করতে পারে। বাংলাদেশেই আজ হ'তে পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে গ্রামাঞ্চলে সূদখোরের দাওয়াত কেউ সহজে গ্রহণ করতে চাইত না। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির দাপটে এবং দ্বীনী শিক্ষা বঞ্চিত হওয়ার কারণে সেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

৪. সরকার যেসব ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে সূদ প্রদান বাধ্যতামূলক করে রেখেছে সেগুলো রহিত করার জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা যেতে পারে। উদাহরণতঃ জমির খাজনা যথাসময়ে দিতে না পারলে তার উপর সূদ দিতে হয়। সূদের বদলে সরকার জরিমানা আরোপ করতে পারে। ঈমান ও আক্বীদাবিরোধী সূদ কেন দিতে হবে? অনতিবিলম্বে সরকার যেন খাজনার খাত থেকে সূদ প্রত্যাহার করে নিতান্তই অপরিহার্য ক্ষেত্রে জরিমানার ব্যবস্থা চালু করে সেই লক্ষ্যে জনমত গঠন করা প্রয়োজন।

উপরে উল্লিখিত কাজগুলো কঠিন নিঃসন্দেহে। কিন্তু মুমিনের জীবনে কোন কাজটি সহজ? বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর তাওয়াক্কুল করে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সমবেতভাবে এসব উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে।

৫. **অনাবশ্যক সামাজিক ব্যয় প্রতিরোধঃ** সমাজে বসবাস করতে হ'লে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে যেমন যোগ দিতে হয় তেমনি আয়োজনও করতে হয়। কিন্তু বিপত্তি বাধে যখন ঐ সব অনুষ্ঠান আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী হয়ে দাঁড়ায়। উপরন্তু অনেক অনুষ্ঠান ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে প্রচলিত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ঐসব অনুষ্ঠানের কোন ধর্মীয় ভিত্তিই নেই। যেমন কেউ মারা গেলে মৃত্যুর পর চল্লিশ দিনের মাথায় ধুমধাম করে দশগ্রামের বা মহল্লার লোকজন ডেকে খানাপিনার আয়োজন করা। ছেলের খাৎনা উপলক্ষ্যে বন্ধু-বান্ধব, পড়শী-স্বজন সকলকে ডেকে উৎসবমুখর পরিবেশ ও ভোজের আয়োজন এবং অভ্যাগতদেরকে উপঢৌকন প্রদানে বাধ্য করা। এছাড়া রয়েছে জন্মদিন, মৃত্যুবার্ষিকী, বিবাহ-বার্ষিকী প্রভৃতি নানা বিদ'আতী অনুষ্ঠান। রয়েছে বিচার আচার ও শালিশী বৈঠক। এসব বৈঠকের জন্য যে প্রচুর ব্যয় হয় তা বলাই বাহুল্য। বিয়ে-শাদীর কথা তো না বলাই ভাল। ইসলামের এই অপরিহার্য ও সরল সামাজিক অনুষ্ঠানটিতে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণে ঢুকে পড়েছে পান-চিনি বা পাত্র দেখা, গায়ে হলুদ, বিয়ের তত্ত্ব পাঠানো এবং অতি অবশ্যই ঘৃণ্য যৌতুক প্রথা। সম্প্রতি যৌতুকবিরোধী মনোভাব দানা বেঁধে ওঠার প্রেক্ষিতে একে গিফট বা উপঢৌকনের লেবাস পরানো হয়েছে।

একজন বিত্তশালী ব্যক্তি অক্লেশে এসব অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম। অনেক ক্ষেত্রে নতুন বিত্তশালী বা হঠাৎ করে ধনী হওয়া লোকেরা সামাজিক পরিচিতি, প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা লাভের জন্য তাদের অর্জিত নতুন বিত্ত খরচ করেন অকাতরে। সমস্যার সৃষ্টি হয় যখন একই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে বলা হয় মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত শ্রেণীর কাউকে। সমাজপতিরা রায় দেন- এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, এটা দিতে হবে। না হ'লে সমাজচ্যুত হ'তে হবে। অথচ এসবের ব্যয়ভার বইবার সাধ্য তার নেই। নিরুপায় হয়ে তখন তাকে সহায়-সম্বল বিক্রি করতে হয় অথবা ঋণ নিতে হয় সূদ দেবার শর্তে। সাধারণতঃ এসব সামাজিক প্রয়োজনে গৃহীত ঋণের সূদের হার বেশ চড়া হয়ে থাকে। কারণ ঋণদাতা ভাল করেই জানে যে, ঋণ গ্রহীতার বিকল্প কোন উপায় নেই। সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য বাধ্য হয়ে নেওয়া এই ঋণ অতি অবশ্যই অনুৎপাদনশীল ও অপ্রয়োজনীয় শ্রেণীর। ফলে তা পরিশোধ করা হয়ে দাঁড়ায় আরও দুরূহ। তাই ঋণের বোঝা চেঁপে বসে গ্রহীতার মাথায় জগদ্দল পাথরের মতো।

শেষ অবধি তাকে শেষ সম্বল চাষের জমিটুকু, এমনকি ভিটেমাটি পর্যন্ত বেচে দিতে হয় ঋণ পরিশোধের জন্য। এই পথে গ্রাম বাংলার হাযার হাযার মাঝারি ও প্রান্তিক কৃষক ভূমিহীন চাষীতে পরিণত হয়েছে। চাকুরীজীবিদের অনেকের ক্ষেত্রে এই ব্যয় পুষিয়ে নেবার অন্যতম উপায় ঘুষ যার বোঝা বইতে হয় পরোক্ষভাবে সমাজের সকলকেই। এর প্রতিবিধান ও প্রতিরোধের জন্য চাই গণসচেতনতা।

অর্থনৈতিক কর্মসূচীঃ

১. শরী'আহ ভিত্তিক ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের প্রসারঃ

আধুনিক সময়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে চাঙ্গা রাখতে হ'লে ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্যতার কথা গুরুত্বের সাথেই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু প্রচলিত সব প্রতিষ্ঠানই সূদনির্ভর বিধায় শরী'আতের সাথে সাংঘর্ষিক। এরই প্রতিবিধানের জন্য গত তিন দশক ধরে মুসলিম বিশ্বে গড়ে উঠেছে ইসলামী শরী'আত ভিত্তিক ব্যাংক, বীমা ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান। আনন্দের কথা, প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই এসব প্রতিষ্ঠান ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং একই সঙ্গে সাফল্য অর্জনেও সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু দেশের সর্বত্র এসব প্রতিষ্ঠানের শাখা তথা কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়তে পারেনি এখনও। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের যেমন রয়েছে নিজস্ব সীমাবদ্ধতা, তেমনি রয়েছে নানা আইনী প্রতিবন্ধকতা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, দেশে ক্রমবিকাশমান ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য আজ অবধি কোন বিধিবদ্ধ আইন প্রণীত হয়নি। গভীর পরিতাপের বিষয়, এদেশে সাংবিধানিকভাবেই ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হ'লেও এ বিষয়ে কোন সরকারই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেননি; বরং এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান নতুনভাবে স্থাপনের ক্ষেত্রে নিরন্তর বিধি-নিষেধ ও নানা পরোক্ষ বাধার বেড়াজাল আরোপিত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষের তরফ হ'তেই। এদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ঈর্ষণীয় সাফল্যে প্রভাবিত হয়ে কয়েকটি সূদী ব্যাংকের ইসলামীকরণ ঘটেছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেশ কয়েকটি ইসলামী বীমা ও ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন। কিন্তু এরপরই নতুনভাবে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এই শর্ত শিথিল করলে আপামর জনগণ ইসলামী পদ্ধতিতেই ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ পাবে। ফলে ক্রমশঃ সূদের বাজার ও দাপট সংকুচিত হয়ে আসবে। সূদ উচ্ছেদের জন্যই দেশে এ জাতীয় আরও প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন এবং একই সাথে সেসবের সেবা তৃণমূল পর্যায়ে পৌছানোর উদ্দেশ্যে যথাযথ কর্মকৌশল উদ্ভাবিত ও বাস্তবায়িত হওয়া আবশ্যক।

২. করযে হাসানা ও মুযারাবা পদ্ধতির বাস্তবায়নঃ

সমাজে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি এবং বিত্তহীন দক্ষ ও যোগ্য লোকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারে করযে হাসানা ও মুযারাবা পদ্ধতি। ইসলামী অর্থনীতির এই অপরিহার্য বিধান দু'টি এদেশে অনুপস্থিত। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, এমনকি সংখ্যালঘু মুসলমানের দেশ শ্রীলংকাতেও মসজিদভিত্তিক করযে হাসানা প্রদান ও সোসাইটিভিত্তিক মুযারাবা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ দেশেও এই ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। সমাজের বিত্তশালী লোকদের করযে হাসানা দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই উদ্যোগ যদি মসজিদকেন্দ্রিক হয় তাহ'লে সত্যিকার যোগ্য লোককে যেমন সুযোগ দেওয়া যাবে, তেমনি এলাকাভিত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের পাশাপাশি সমাজ সচেতনতা ও সমাজকল্যাণ নিশ্চিত হবে।

মুযারাবা পদ্ধতি এদেশে চালু করতে সময়ের প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজন হবে আইন কাঠামো বদলানোর, পাশাপাশি উত্তম চরিত্রের লোক সৃষ্টির। উত্তম ও যোগ্য লোকেরা মুযারাবার মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি উভয়বিধ উপায়েই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে। উপরন্তু সমাজের বিত্তশালী লোকদের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্য প্রয়োজন তাদের ইসলামী অনুশাসন জানতে ও অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করা। এর ফলে দুঃসময়ে প্রয়োজনীয় ঋণ পাওয়া সহজ হবে বিনা সূদেই এবং বিনিয়োগ গ্রহীতা সূদ প্রদানের বাড়তি দায় হ'তে রক্ষা পাবে। করযে হাসানা দিলে সেই অর্থের জন্য আয়কর দিতে হবে না এবং মুযারাবার ক্ষেত্রে ছাহিবুল মাল বা সম্পদের মালিককে কেবল মুনাফার নির্দিষ্ট পরিমাণের ঊর্ধ্বের জন্য আয়কর দিতে হবে এমন আইন করে বিত্তশালী মুসলিমদের মনোযোগ এ ক্ষেত্রে আকর্ষণ করা সম্ভব।

৩. ক্ষুদ্র বিনিয়োগের উপযুক্ত কৌশল উদ্ভাবনঃ

দরিদ্র অথচ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্যে পুঁজির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সেই পুঁজির পরিমাণও যে খুব বেশী এমন নয়। কিন্তু তাই-ই তাদের কাছে সহজলভ্য নয়। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল হিসাবে ক্ষুদ্রঋণের প্রসার ঘটেছে। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ছোট-বড় জাতীয়-আঞ্চলিক মিলিয়ে পাঁচ শতাধিক এনজিও এই কাজে অংশগ্রহণ করে চলেছে। কিন্তু দরিদ্র জনগণ, বিশেষতঃ মহিলারা যারা ক্ষুদ্র ঋণের সর্ববৃহৎ ক্লায়েন্ট তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কি সত্যি সত্যি দৃশ্যমান ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে? দু'চারটি সম্মানজনক ব্যতিক্রমী ঘটনাকে উদাহরণ হিসাবে দেখানো যায়, কিন্তু সেসবের ভিত্তিতে সরলীকরণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লে বিপত্তি ঘটে। ঋণ ও সূদ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নির্দিষ্ট হারে সূদসহ কিস্তি প্রদানের শর্তেই এনজিওরা ঋণ দিয়ে থাকে। পুঁজি পাওয়ার কোন সহজ উপায় না থাকায় নিরুপায় হয়েই দরিদ্র মহিলা ও পুরুষরা ঋণ নেয়। এই ঋণের সূদের হার যথেষ্টই চড়া।

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য পরিচালিত সম্প্রতি সমাপ্ত কয়েকটি মাঠ গবেষণা তথ্য

Contents

হ'তে দেখা গেছে, এনজিওদের প্রদত্ত ঋণ ব্যবহার করে গ্রামীণ মহিলাদের দারিদ্র্য যেটুকু হ্রাস পেয়েছে তা খুবই অকিঞ্চিৎকর। তাদের স্বনির্ভরতা অর্জন বা নীট দারিদ্র্য হ্রাস ঘটেনি। এর প্রধান কারণ, প্রাপ্ত ঋণ কাজে লাগিয়ে ঋণগ্রহীতারা যা উপার্জন করে তার বৃহৎ অংশই চলে যায় সূদ শোধ করতে। ফলে তাদের হাতে উদ্বৃত্ত থাকে যৎসামান্যই। তাদের অপেক্ষায় থাকতে হয় পুনরায় ঋণ পাবার জন্য। পুনরায় ঋণ না পেলে তার কর্মসংস্থানের উপায়টিও রুদ্ধ হয়ে যায়। এছাড়া সূদসহ মূলধনের কিস্তি শোধ করতে গিয়ে বহু সময়েই দারুণ বিড়ম্বনাময় পরিস্থিতির শিকার হ'তে হয় ঋণগ্রহীতাকে। সূদভিত্তিক এনজিওর মাঠকর্মীরা খাতকের ঘরের চালের টিন খুলে নিয়েছে, শেষ সম্বল দুধের গরু ধরে নিয়ে গেছে, এমনকি ন্যূনতম ভব্যতার মুখোশ ছুঁড়ে ফেলে সধবার নাকফুল পর্যন্ত খুলে দিতে বাধ্য করেছে কিস্তির টাকা পরিশোধের জন্য। এমন ঘটনা প্রকাশিত হচ্ছে দেশের জাতীয় দৈনিকগুলিতে। কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে অপমানের জ্বালা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে এমন উদাহরণও অপ্রতুল নয়।

এই অবস্থা হ'তে পরিত্রাণের জন্য বিকল্প ইসলামী পদ্ধতিসমূহের ব্যবহার করতে হবে। উদ্যোগ নিতে হবে ঋণ নয়, বিনিয়োগ প্রদানের জন্য। এই উদ্দেশ্যে অংশীদারিত্বমূলক বিনিয়োগ স্কীম বা Partcipatory Investment Scheme চালু করা বাঞ্ছনীয়। এটি মুযারাবা পদ্ধতিরই একটি রূপ। এই পদ্ধতিতে বিনিয়োগ হ'তে অর্জিত মুনাফার একটা অংশ পাবে সংশ্লিষ্ট এনজিও, বাকীটা পাবে উদ্যোক্তা। লাভ যদি না হয় তাহ'লে উদ্যোক্তাকে কোন বাড়তি ঝুঁকি নিতে হবে না। এক্ষেত্রে যেহেতু পূর্বনির্ধারিত হারে সূদ পরিশোধের শর্ত নেই সেহেতু লাভ না হ'লেও বাধ্যতামূলকভাবে সূদ প্রদানের দায়িত্বও নেই। কাজেই কষ্টার্জিত উপার্জনের সিংহভাগ তুলে দিতে হবে না এনজিওদের হাতে। প্রকৃত অর্থে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রহীতারাই উপকৃত হবে এই পদ্ধতিতে। পাইলট স্কীম হিসাবে হ'লেও এই পদ্ধতি চালু করা সময়ের দাবী। তৃণমূল পর্যায় হ'তে সূদ উচ্ছেদের জন্য এটি কার্যকর কৌশল হিসাবে বিবেচিত হ'তে পারে।

৪. **আড়ম্বরপূর্ণ ব্যয় পরিহারঃ** বিলাসিতা ও আড়ম্বরপ্রিয়তার পথ ধরে অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পায়। এক সময়ে নিয়মিত উপার্জনে ব্যয় সংকুলান না হ'লে ঋণের আশ্রয় নিতে হয়। এই মোক্ষম সুযোগে সূদ অনুপ্রবেশ করে সংসারে, সাধ্যের বাইরে যেয়ে বিলাসবহুল বাড়ী বানাতে হ'লে, ফ্যাশানেবল গাড়ী কিনতে হ'লে, কেতাদুরস্ত লাইফস্টাইল অনুসরণ করতে হ'লে ঋণ না করে উপায় নেই। পূর্বেই বলা হয়েছে, ঋণ ও সূদ অঙ্গাঙ্গী সম্পৃক্ত। তাই ঋণ পেতে হ'লে সূদ দেবার অঙ্গীকার করতেই হয়। উপরন্তু বর্তমান সময়ে কিস্তিতে যেসব গৃহসামগ্রী ও ইলেকট্রিক-ইলেকট্রনিক দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি হয় সেসবেও যুক্ত রয়েছে সূদ। তাই ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন হ'তে সূদ উচ্ছেদ করতে হ'লে অতি অবশ্যই বিলাসিতা, অসুস্থ প্রতিযোগিতা, অন্যের অন্ধ অনুসরণ এবং আড়ম্বরপ্রিয়তা পরিহার করা যৌক্তিক দাবী।

উপসংহারঃ

আশা করা যায়, উপরে আলোচিত উপায়সমূহ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে এদেশে সূদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি সম্ভব। এর ফলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষিত হারাম বর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস সূচিত হবে। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মন-মানসিকতা প্রবলভাবে ইসলামমুখী। পক্ষান্তরে বিদ্যমান আইন-কাঠামো, সামাজিক আচরণ, এমনকি ব্যবসায়ীদের অধিকাংশেরই চিন্তা-চেতনা ইসলামী ঈমান-আক্বীদার সাথে সাংঘর্ষিক। ফলে সমাজে বিরাজমান রয়েছে এক বিসম অবস্থা।

আজও পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ও রোমান-বৃটিশ আইন দ্বারা এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান নিয়ন্ত্রিত। এই প্রতিকূল অবস্থার কথা বিবেচনায় রেখেই বলা যায়, সূদ বর্জন ও উচ্ছেদের জন্য যেমন একদিকে চাই ঈমানের জোর ও সূদের নানামুখী ধ্বংসাত্মক কুফল সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান, অন্যদিকে তেমনি চাই সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ। সূদ উচ্ছেদ ও বর্জনের কৌশল হিসাবে যেসব উপায়ের আলোচনা করা হয়েছে সেগুলিই শেষ কথা নয়, আরও উপযুক্ত পথ বা কৌশল উদ্ভাবিত হ'তে পারে। কিন্তু কাগজের পাতাতেই এসব কৌশল আবদ্ধ থাকলে কোন সুফল আসবে না। বরং বাস্তবায়নযোগ্য একটি এ্যাকশন প্ল্যান রচনা করে সেই অনুযায়ী ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে এগিয়ে গেলে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রাপ্তিরও আশা করা যায়।

বস্তুতঃ অর্থনীতি সূদবিহীন হ'লে বিনিয়োগের জন্য যেমন অর্থের অব্যাহত চাহিদা থাকবে তেমনি সঞ্চয়েরও সদ্ব্যবহার হবে। এর ফলে নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও সম্পদের সুষম বণ্টন ঘটবে। প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। একচেটিয়া কারবার হ্রাস পাবে। অতি মুনাফার সুযোগ ও সমাজ স্বার্থবিরোধী বিনিয়োগ বন্ধ হবে। এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন ও বড় ধরনের শোষণের পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্যই ইসলাম সূদকে হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করেছে। বস্তুতঃ যুলুম ও বঞ্চনার অবসান ঘটাতে হ'লে তার উৎসকেই সমূলে বিনাশ করতে হবে। সেটাই বৈজ্ঞানিক পন্থা। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন ক্বারীব'। তবে সেজন্য নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। এক অর্থে সূদ উচ্ছেদ একটি জিহাদ। তাই এজন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। তবেই সূদের ভয়াবহ যুলুম হ'তে মানবতা মুক্তি পাবে। হালাল রিযিক প্রাপ্তির মাধ্যমে দোওয়া কবুলের বদৌলতে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও ক্ষমা লাভের সুযোগ হবে। একই সাথে ইহলৌকিক কল্যাণের পাশাপাশি পারলৌকিক সাফল্যও নিশ্চিত হবে।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

কপাল গাড়ীর চাকা

এ জগতে অনেক মানুষ কপাল গুণে সম্পদশালী কিংবা ক্ষমতাধর হয়েছেন। রাখাল বালক নাদির ভাগ্যগুণে ইরানের প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহ হয়েছিলেন। ইরানের চেয়ে আয়তনে প্রায় ৩ গুণ বড় দেশ ভারত। মোগল সম্রাটগণ দিল্লী হ'তে এ বিশাল দেশ শাসন করতেন। নাদির শাহ দিল্লী আক্রমণ করতে অগ্রসর হ'লেন। দিল্লীর তৎকালীন বাদশাহ তাঁর আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে ময়ূর সিংহাসন, প্রচুর ধনরত্ন এমনকি নিজ কন্যাকে তাঁর এক ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে হীন শর্তে দিল্লী ফিরিয়ে পেয়েছিলেন। এ নাদির শাহই আবার তাঁর শেষ জীবনে চূড়ান্ত পতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এসব কার লীলা-খেলা? কে যেন অদৃশ্য থেকে এসব নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। যাঁর ইশারায় বিশ্বের এ উত্থান-পতন সংঘটিত হয়ে থাকে, তিনিই হ'লেন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। এখানে মানুষের কর্তৃত্ব কিছুই নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের একজন খ্যাতনামা প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন জীবনের গোড়ার দিকে দিনমজুরের কাজ করেছেন। নদীতে গলিযোগে নৌকা চালিয়েছেন। এহেন ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি দেশের দু'দু'বার প্রেসিডেন্ট পদ অলংকৃত করেছিলেন। তিনি একজন মানব দরদী ব্যক্তি ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল। আফ্রিকার কৃষ্ণকায় নিগ্রো জাতি সে দেশের প্রভূত ধনী ব্যক্তির ক্রীতদাস হিসাবে জীবন যাপন করত। তিনি আইন করে এ ক্রীতদাস প্রথার বিলুপ্তি সাধন করেন। এর পরিণতি হিসাবে তাঁকে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিতে হয়।

নেপোলিয়ান ও হিটলারের জীবনী আলোচনা করলে একই চিত্র ফুটে উঠে। জীবনের গোড়ার দিকে তারা কেউই তেমন কিছু ছিলেন না। পরবর্তীতে নেপোলিয়ান সমগ্র ইউরোপ প্রকম্পিত করেছিলেন। শেষে ওয়াটার লুর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি আর্থার ওয়েলেসলীর নিকট পরাজিত ও বন্দী হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ সেন্টহেলেনায় নির্বাসিত হন। সেখানে স্বজাতি ও স্বজন বঞ্চিত হয়ে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

হিটলারও ধাপে ধাপে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে সমগ্র ইউরোপ তথা সারা বিশ্বে ১৯৩৯-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধের তান্ডবলীলা চালিয়ে শেষে উপায়ান্তর না দেখে দেশ ছেড়ে পালিয়ে হল্যান্ডে গিয়ে আত্মগোপন করেন।

কপাল গাড়ীর চাকা, এ চাকা তাহ'লে ঘুরে কিভাবে? কে এ চাকা কিভাবে ঘুরান? এ প্রসঙ্গে ছোট একটি গল্প বলি।

স্বামী মারা গেলে দু'শিশু পুত্র সন্তান নিয়ে মনোয়ারা কঠিন বিপদে পড়ে। ভিক্ষাবৃত্তি করেই কোন রকমে শিশু দু'টিকে একটু বড় করে তুলে। একদিন মনোয়ারা ছেলে দু'টিকে খাইয়ে নিজে খেতে বসবে, এমন সময় এক ফকীর এসে তার কাছে খাবার চাইল। ফকীর গ্রামের অধিকাংশ বাড়ীতে খাবার চেয়ে বিফল হয়ে শেষে ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে মনোয়ারার কাছে খাবার চায়। ফকীরের ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করতে পেরে সে নিজের খাবারটুকু ফকীরকে খেতে দেয়। ফকীর পেট ভরে খেয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করে, 'হে আল্লাহ! তুমি এ মহিলাকে দানশীলা বানাও। এদেরকে বিষয়-সম্পদ দান করো। এরা যেন সুখে থাকে। এর ছেলে যেন হজ্জ করতে পারে'।

ফকীরের দো'আ শুনে মনোয়ারা মনে মনে হাসে। যারা খেয়ে পরে কোনমতে বেঁচে আছে, তাদের বিষয়-সম্পদ হবে কিভাবে? হজ্জ করা তো সুদূর পরাহত।

কিছুদিন পরে পার্শ্ববর্তী গ্রামের একজন মধ্যবিত্ত লোকের স্ত্রী মারা গেলে সে মনোয়ারাকে বিয়ে করে। ছেলে দু'টিও ঐ বাড়ীতে আশ্রয় পায়। লোকটি ছিল সৎ চরিত্রের অধিকারী। তার আগের স্ত্রীর এক পুত্র সন্তান আছে। বিমাতা ও ছেলে দু'টির প্রতি তার আচরণ ভাল নয়। লোকটি তার আচরণ দেখে একদিন ছেলেকে কাছে ডেকে অতি নরম সুরে তাকে বুঝায়, 'বাবা! তুমি তোমার বিমাতা ও ছেলে দু'টির প্রতি হিংসা করো না। এরা ইয়াতীম, অসহায়। নিরুপায় অবস্থায় আমার এখানে আশ্রয় পেয়েছে। তুমি ছেলে দু'টিকে নিজের ভাইয়ের মত ভালবাসবে। তাহ'লে আল্লাহ পাক তোমাকেও ভালবাসবেন। তুমি তো জান, আমি আমার সাধ্যমত গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করে থাকি। আর জেনে রাখ, কেউ কাউকে খাওয়ায় না। বরং আল্লাহ পাকই সকলকে খাওয়ান। পিতার কথায় ছেলের মনে পরিবর্তন আসে।

গৃহস্বামী আশ্রিত বড় ছেলেকে একটি দোকান করে দিল। দোকানে বেশ বেচা-কেনা চলতে থাকে। ফলে আস্তে আস্তে পুঁজি বাড়তে থাকে। একবার মহাজনের কাছ থেকে ছেলেটি ৫০ টিন কেরোসিন তেল কিনে আনে। একটি টিন কাটার পর দেখা গেল তাতে কেরোসিনের বদলে নারিকেল তেল রয়েছে। এরপর একে একে সব টিন কাটা হ'ল। সবগুলিতে নারিকেল তেল পাওয়া গেল। এতে ছেলেটির আনন্দ আর ধরে না। বিষয়টি গৃহস্বামীও জানল। সে ছেলেকে সব তেল মহাজনকে ফিরিয়ে দিতে আদেশ করল। আশ্রয়দাতা পিতার আদেশমত ছেলেটি সব তেল মহাজনকে ফেরত দিতে গেল। মহাজন লোকটিও ছিলেন সৎ। তিনি খতিয়ে দেখলেন, একটিনও নারিকেল তেল তিনি কিনেননি। তিনি বললেন, এ তেল তোমার ভাগ্যেই এসেছে। তুমি এসব ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

এরপর দোকানের আরো প্রসার হ'ল। তিন ভাই মিলেমিশে দোকানে কাজ করতে লাগল। আল্লাহ্‌র দয়াতে এবং দোকানের বদৌলতে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হ'ল। পরবর্তীতে দশ গাঁয়ের মধ্যে তারাই হ'ল সবচেয়ে ধনী। এরপর দোকানদার ছেলেটি হজ্জও করল। ক্ষুধার্ত ফকীরের দো'আ যেন আল্লাহ পাক পুরাপুরি কবুল করেছেন।

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাঁড়া, নওগাঁ।

Contents

চিকিৎসা জগত

ক্যান্সারবিরোধী খাদ্য

রোগ আরোগ্যের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা যরূরী। আর সেজন্য দরকার রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান। নিয়মিত ফলমূল, শাকসবজি ও তরিতরকারি খেলে জটিল রোগ ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব। অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত গোশত, ভাজা-পোড়া, বাসি খাবার, মাদকদ্রব্য বা ধূমপান ক্যান্সার রোগ সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধে খাদ্যঃ

কাঁচা রসুন ও পেঁয়াজঃ বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কারসিনোজেনগুলোকে রসুন ও পেঁয়াজের রাসায়নিক পদার্থ সহজেই ধ্বংস করে দেয়। রসুন দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বহুগুণে বৃদ্ধি এবং ক্যান্সারসহ নানা রোগের অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করে। 'লোমা লিন্ডার ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনে'র এক গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়, রসুনের উপাদানগুলো ক্যান্সার কোষের জন্য ভয়ানক বিষাক্ত। রসুন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে এবং টিউমারসেলকে ধ্বংস করে দেয়। ক্যান্সার প্রতিরোধ খাদ্যের সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ যোগ করেছেন হার্ভার্ডের বিজ্ঞানীরা। অতএব আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় কাঁচা রসুন ও পেঁয়াজ যুক্ত করা দরকার।

চাঃ বাটগার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা রিপোর্টে জানা যায়, রং সবুজ বা কালো চায়ের রাসায়নিক পদার্থ ক্যাটেচিনস আশ্চর্যজনকভাবে ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। অতএব যারা দুধ চা পসন্দ করেন, তাদের জন্য দুধ চায়ের পরিবর্তে রং, সবুজ বা কালো চা পান করা উচিত।

দুধঃ দুধের ভেতর সব ধরনের ভিটামিন, প্রোটিন ও ধাতব লবণ বিদ্যমান। দুধ যেমন পুষ্টিকর, তেমনই সুস্বাদু। দুধের ক্যালসিয়াম, রাইবোফ্লাভিন, ফসফরাস, সোডিয়াম, ম্যাগাসিয়াম স্নেহপদার্থ শ্বেতসার (ল্যাকটোজ) ও প্রোটিন শারীরিক গঠন ঠিক রাখে এবং ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পদার্থকে ধ্বংস করে।

গমের আটাঃ গমের আটা বেশ পুষ্টিকর। তাই দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় গমের আটার রুটি থাকা উচিত। আমেরিকান হেলথ ফাউন্ডেশনের এক রিপোর্টে জানা গেছে, গমের আটা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী হরমোন ইস্টোজনের পরিমাণ অনেক কমিয়ে দিয়ে ক্যান্সারবিরোধী ভূমিকা পালন করে। এছাড়া পালংশাক, পুঁইশাক, কচুশাক, লালশাক, টমেটো, গাজর, মিষ্টি আলু, কুমড়া, শিম, শালগম, বরবটি, ফুলকপি, বাঁধাকপি ও মূলাসহ প্রভৃতি তরিতরকারি এবং আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, কলা, পেয়ারা, পেঁপে, জাম্বুরা, কমলালেবু, কদবেল, লেবু, কামরাঙ্গা, জলপাই, আমড়া ও কুলসহ নানা ফলে রয়েছে ক্যান্সারবিরোধী প্রচুর উপাদান। টক ফল বা টকজাতীয় খাদ্যে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে ক্যান্সারবিরোধী রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, যা দেহে শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে।

তুঁতপাতা ডায়াবেটিস কমায়

তুঁত গাছের আদি বাসস্থান চীনে। পৃথিবীর রেশম উৎপাদনকারী সকল দেশেই এটা পাওয়া যায়। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং আফ্রিকায়ও কিছু কিছু তুঁত পাওয়া যায়। বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই তুঁত গাছ জন্মে। তবে রাজশাহী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে জন্মে। এটি কাটিং বীজ বা গ্রাপটিং-এর মাধ্যমে বংশ বিস্তার ঘটায়। শরৎকালে পাতা সংগ্রহ করা যায়।

পাতায় বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদানঃ তুঁত পাতায় বিদ্যমান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি উপাদান হ'ল রুটোসাইড এবং DNJ (১-ডি অক্সিনোজিমাইসিন)। সম্প্রতি চাইনিজ এক গবেষণায় দেখা গেছে, রুটোসাইড এবং DNJ (১-ডি অক্সিনোজিমাইসিন) রক্তের চর্বি, রক্তচাপ, রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ও বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে তারা ডায়াবেটিস চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে তুঁতপাতা ব্যবহার শুরু করেছে। অন্যান্য উপাদানের মধ্যে রয়েছে ফ্ল্যাভনয়েড, এন্থোসায়ানিন, আর্টোক্যাপনি, সাইট্রিক লবণ, ম্যালিক এসিড।

শুকনা পাতায় বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদানঃ পাতায় বিদ্যমান স্ট্রিল, লিনালিল এসিটেট, লিনালোল, টার্পিনাইর এসিটেট এবং হেক্সিনোল রেশমগুটিদের আকৃষ্ট করে। আর বিটাসাইটোস্টেরল (০.২%) ও অন্যান্য স্টেরল কামড় দিতে উদ্বুদ্ধ করে। পাতায় বিদ্যমান বিটা সাইটোস্টেরলের মাত্রার উপর নির্ভর করে লার্ভাগুলো কি পরিমাণ খাবার খাবে।

পাতার ঔষধি গুণঃ তুঁতপাতা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণক, কফ নিঃসারক, লিভার টনিক, দৃষ্টিশক্তি বর্ধক, ফুসফুসের সমস্যা, ওযন হ্রাসকারক। এটি ঘর্মকারক, দাঁত ব্যথা নিবারক, ঠাণ্ডা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, চোখের সংক্রমণ নিবারক। পাতার নির্যাস দিয়ে গড়গড়া করলে স্বরযন্ত্রের প্রদাহ সেরে যায়। স্থানীয় ব্যবহারে চুল গজায়। গোদরোগে পাতার নির্যাস ইনজেকশন আকারে ব্যবহার করা হয়। এর পাতা থেকে হোমিও ওষুধ তৈরী করা হয়ে থাকে। চাইনিজ ট্রেডিশনাল মেডিসিন তুঁতপাতা মিষ্টি, তিক্ত ও শীতল গুণাবলী সম্পন্ন। তুঁতপাতা সবুজ রং উৎপাদনেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মালবেরি টিঃ তুঁতপাতা থেকে সবুজ চা হয়, যা 'মালবেরি টি' নামে ব্যাপক জনপ্রিয়। এর অনেক ঔষধি গুণ রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এটি ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করে, রক্তনালীর কোলেস্টেরল ও উচ্চরক্তচাপ কমায়, ওযন হ্রাস করে, হাঁপানীর কষ্ট কমায়, শরীরে শক্তি যোগায়। প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকায় হাড়ের ভঙ্গুরতা রোধ করে, ভিটামিন 'এ' থাকায় দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, ভিটামিন বি১ ও বি২ এর উৎস, দেহের প্রয়োজনীয় এমাইনো এ্যাসিডের যোগান দেয়, এন্টি ক্যান্সার হিসাবে কার্যকর।

কাণ্ডের ছালঃ কোষ্ঠ পরিষ্কারক, ক্রিমিনাশক।

মূলের ছালঃ শীতকালে মূল সংগ্রহ করা যায়। এর ক্বাথ দাঁত ব্যথা, কোষ্ঠনাশক হিসাবে কার্যকর।

তুঁত ফলঃ তুঁতগাছ থেকে স্ট্রবেরীর ন্যায় তুঁত ফল পাওয়া যায়। তুঁত ফলকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ভাষায় Sorosis বলা হয়। কারণ অনেকগুলো ফুলের সমাবেশের ফলে এই ফল সৃষ্টি হয়। এটি রসালো, হাল্কা টক স্বাদযুক্ত মিষ্টিফল। কাঁচা অবস্থায় ফল সাদা থাকে এবং টক হয়। পাকলে গাঢ় নীল বর্ণ ধারণ করে এবং মিষ্টি হয়।

তুঁত ফলকে আধুনিক চাইনিজ মেটেরিয়া মেডিকাগুলোতে রক্তবর্ধক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়াও এটি কিডনি দুর্বলতা, শারীরিক দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা দূর করে এবং চুলের অকাল পক্বতা রোধ করে। এছাড়াও মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা, কানে ঝি-ঝি শব্দশোনা, ঘুমঘুমভাব এবং কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারক। পরিপাকতন্ত্রের ক্রনিক ডিজিজ, গ্যাষ্ট্রিক রস নিঃসরণ, হজম ও শোষণ বাড়ায়, রুচি বৃদ্ধি করে, পেটের ফোলা, ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটস (পাকস্থলীর প্রদাহ) ও ক্রনিক হেপাটাইটিস নিরাময় করে। ফল খেলে মুখের ফোলা ও পানি জমা হ্রাস পায় এবং মূত্রকৃচ্ছতা দূর হয়। কোন ধরনের প্রিজারভেটিভ ছাড়াই তুঁত ফলের রস তিন মাস ফ্রিজে রাখা যায়। তুঁত ফলের রস থেকে এক ধরনের স্বাস্থ্যকর পানীয় উৎপাদন করা হয়, যা চীন, জাপান ও কোরিয়ায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এছাড়াও তুঁত ফল থেকে লালচে বেগুনী বর্ণের রং পাওয়া যায়।

তুঁত ফলে এন্থোসায়ানিন নামক এক বিশেষ ধরনের রঞ্জক পদার্থ রয়েছে। যাকে সায়ানিন বলা হয়। যা ফলকে লালাভ-বেগুনী বর্ণ দান করে। পাকা ফলে প্রচুর এন্থোসায়ানিন থাকে। এন্থোসায়ানিন একটি শক্তিশালী এন্টিঅক্সিডেন্ট, যা হৃদযন্ত্র সুরক্ষা করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, ভাইরাস প্রতিরোধ করে ও মানসিক চাপ কমায়।

ঔষধি ব্যবহারঃ ডায়াবেটিস, জ্বর, হাঁপানি, উচ্চ রক্তচাপ, ব্রংকাইটিস, গলাব্যথা, এনিমিয়া ক্রিমি, ডায়াবেটিস, ঘা, অকালপক্কতা, ব্যথা নিবারক, এন্টি এজিং।

সেবন মাত্রাঃ শুকনো ফল প্রতিদিন ৯-১৫ গ্রাম নির্যাস আকারে গ্রহণ করলে ৯০-১৫০ মি.গ্রা. এন্থোসায়ানিন পাওয়া যায়। নির্যাস আকারে ৫-১০ গ্রাম পাতার চূর্ণ আধালিটার পরিমাণ পানিতে ১০-১৫ মিনিট সিদ্ধ করে দিনে ৩ বার সেব্য। *[সংকলিত]*

ক্ষেত-খামার

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন

পেঁয়াজ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরি ফসল। পেঁয়াজ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে নিত্যদিনের ব্যবহৃত একটি মসলা। তাছাড়া সবজি, সালাদ ও ঔষধি হিসাবেও এর ব্যবহার ব্যাপক। উপরন্তু পেঁয়াজের পাতা ও ডাঁটা ভিটামিন সি ও ক্যালশিয়াম সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে পেঁয়াজের চাষ রবি মৌসুমে সীমাবদ্ধ এবং বাজারে মে মাস পর্যন্ত এর সহজলভ্যতা বজায় থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে মাত্র ৩৫ হাযার হেক্টর জমিতে প্রতি বছর প্রায় ১ লাখ ৩৫ হাযার মেট্রিক টন পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। অথচ দেশে বছরে প্রায় ৫ লাখ ৬০ হাযার মেট্রিক টন পেঁয়াজ প্রয়োজন। এই হিসাবে বার্ষিক ঘাটতি ৪ লাখ ১০ হাযার মেট্রিক টন। প্রতি কেজি পেঁয়াজ ১৫ টাকা হারে বছরে এই ঘাটতি পূরণের জন্য বাংলাদেশ প্রায় ৬০০ কোটি টাকার পেঁয়াজ বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করে থাকে।

এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন নিয়ে গবেষণা করে। উক্ত গবেষণায় ব্যবহৃত পেঁয়াজের জাতটি সফলভাবে দেশের সর্বত্র বসতবাড়ী ও মাঠ ফসল হিসাবে চাষ করা যায় এবং একই জমিতে বছরে তিনবার ফসলটি ফলানো যায়। তাছাড়া পরিমিত সার প্রয়োগ করে এর ফলন গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে প্রতি হেক্টরে ১৮-২৪ টন এবং শীতকালে প্রতি হেক্টরে ৩০-৩৫ টন পর্যন্ত ফলানো সম্ভব। অধিকন্তু এ পেঁয়াজের জাতটি থেকে আমাদের আবহাওয়ায় বীজও উৎপাদন করা যায়।

মাটিঃ ভাল নিষ্কাশনযুক্ত দো-আঁশ, এঁটেল দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ ও পলিযুক্ত মাটি পেঁয়াজ চাষের জন্য উত্তম। তবে যে কোন প্রকার মাটিতে উদ্ভাবিত জাতটি চাষ করা যায়। পেঁয়াজের সফল চাষের জন্য মাটি অবশ্যই উর্বর ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। নতুন উদ্ভাবিত জাতটি সারাদেশে সারাবছর বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা যায়।

জমি তৈরীঃ মাটির অবস্থাভেদে ৪-৬টি চাষ ও মই দিয়ে খুব ভালভাবে জমি প্রস্তুত করতে হবে।

চারা উৎপাদনঃ উত্তমরূপে প্রস্তুত বীজতলায় এক হেক্টর জমির জন্য ৪-৫ কেজি ভাল বীজ বুনতে হবে। বীজতলার আয়তন ৩ মিটার×১ মিটার (৬ হাত×২ হাত) করা উত্তম। প্রতি বীজতলায় ৩০-৪০ গ্রাম হারে বীজ বুনতে হবে। প্রতি হেক্টর জমির জন্য ১২০-১৩০টি উপরোক্ত আকারের বীজতলা প্রয়োজন হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য বীজতলা বাঁশের ছাউনি ও পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।

সার প্রয়োগঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন পেঁয়াজের উপর সার প্রয়োগ সংক্রান্ত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, পরিমিত পরিমাণ রাসায়নিক ও জৈব সার প্রয়োগ করে পেঁয়াজের উৎপাদন ৪-৫ গুণ বৃদ্ধি করা যায়। তাই পেঁয়াজ চাষে হেক্টরপ্রতি নিম্নলিখিত হারে জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হ'ল।-

সারের নাম	পরিমাণ
গোবর অথবা মুরগির বিষ্ঠা (যে কোন ১টি)	৫ টন/৩ টন
ইউরিয়া	২৬০ কেজি
টিএসপি	২২০ "
এমপি	২০০ "
জিপসাম	১৮০ "

সার প্রয়োগ পদ্ধতিঃ শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর অথবা মুরগির বিষ্ঠা (যেকোন একটি), টিএসপি ও জিপসাম সমানভাবে ছিটিয়ে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া ও অর্ধেক মাটি চারা রোপণের ১০ দিন পর, এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া ও অর্ধেক এমপি ৩৫-৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। মাটি শুকনা হ'লে ও প্রয়োজনীয় রস না থাকলে সারের উপরি প্রয়োগের পরপরই হাল্কা সেচ দিতে হবে।

চারা রোপণঃ ৪০-৫০ দিন বয়সের চারা ১৫ সেমি. অন্তর লাইন করে ৮-১০ সেমি. অন্তর লাগাতে হবে।

পানি ব্যবস্থাপনাঃ বর্ষাকালীন পেঁয়াজ কাদা মাটিতে লাগানো যায়। চারা লাগানোর পরপরই যদি কোন কারণে জমিতে রস না থাকে, তবে যরূরীভিত্তিতে একটা হাল্কা সেচ দিতে হবে। তাছাড়া যদি জমিতে রস না থাকে এবং পরিমিত বৃষ্টি না হয়, তবে মাঝে মাঝে হাল্কা সেচ দিতে হবে। উল্লেখ্য, জমিতে যথেষ্ট রস না থাকলে সার ব্যবহার করলেও পেঁয়াজ গাছ তা গ্রহণ করতে পারে না। তাই গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পানি নিষ্কাশনঃ জমিতে বৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে যদি পানি জমে যায় তবে দ্রুত পানি বের করে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ পেঁয়াজ গাছ দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না। তাই জমি তৈরীর পূর্বেই প্রয়োজনীয় নালা কেটে রাখতে হবে। জমিতে ২-৩ ইঞ্চি উঁচু আইল তৈরী করে দিতে হবে।

মালচিংঃ পেঁয়াজের জমিতে মাটি জো আসার সঙ্গে সঙ্গে ভালভাবে মালচিং করে দিতে হবে অর্থাৎ চটা ভেঙ্গে দিতে হবে। খড় বা অন্য মালচিং দ্রব্য দিয়ে ঢেকে দিয়ে মাটির রস সংরক্ষণ করতে হবে।

রোগ দমনঃ সাধারণতঃ ছত্রাকজনিত পারপোল ব্লচ রোগই পেঁয়াজে বেশী দেখা যায়। এ রোগে পেঁয়াজের পাতায় প্রথমতঃ বাদামি বর্ণের দাগ পড়ে। এর ফলে পেঁয়াজের পাতার ঐ অংশ পুড়ে যায়। এভাবে বেশী আক্রান্ত হ'লে ফসল পাকার আগেই গাছ মরে যায় এবং ফলন ৩০-৫০ ভাগ কমে যেতে পারে। তাই উৎপাদন আশানুরূপ পাওয়ার জন্য চারা লাগানোর ২-৩ দিনের মধ্যে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রোভরাল বা রিডোমিল মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। একইভাবে দু'মাস প্রতি ১৫ দিন অন্তর অন্তর রোভরাল এই পরিমাণ ওষুধ প্রয়োগ করে সফলভাবে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

আগাছা দমনঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন পেঁয়াজের জমিতে প্রচুর আগাছা জন্মে। তাই লাগানোর পর প্রথম ৭-১০ দিনের মধ্যে ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। এভাবে ১৫ দিন পর পর মোট ২-৩ বার আগাছা পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

ফসল সংগ্রহঃ সাধারণতঃ চারা লাগানোর ৮০-৯০ দিনের মধ্যে পেঁয়াজ পরিপক্কতা অর্জন করে। পেঁয়াজের বয়স ৭০-৭৫ দিন হওয়ার পর গাছের ডগা ভেঙ্গে দিলে ফলন ভাল পাওয়া যায়। সঠিকমাত্রায় সার ও অন্যান্য পরিচর্যা করে হেক্টরে গ্রীষ্ম-বর্ষাকালে ১৮-২৪ টন এবং শীতকালে হেক্টরে ৩০-৩৫ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

সংরক্ষণঃ ভালভাবে পাকার পর পেঁয়াজ সংগ্রহ করে, পাতা কেটে ৫-৭ দিন বায়ু চলাচল সুবিধাযুক্ত শীতল ও ছায়াযুক্ত স্থানে শুকিয়ে নিতে হবে। ভাল কন্দগুলো যথাযথভাবে বাছাই করে শুষ্ক, ঠাণ্ডা ও বায়ু চলাচলের উপযুক্ত জায়গায় মাচা তৈরী করে ৩-৪ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন জাতের সংরক্ষণ ক্ষমতা দেশী জাতের তুলনায় কম। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিক্রয় বা ব্যবহার করে ফেলতে হবে।

[সংকলিত]

Contents

কবিতা

মুমিন বলি তাকে

- আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

হাযার বাধা উল্টে ফেলে
মুওয়াযযিনের ডাকে
ওয়াক্ত মত মসজিদে যায়
মুমিন বলি তাকে।
ললাট যাহার সেজদায় রত
ধরার ধূলার পরে
সেই তো সঠিক বান্দা আল্লাহ্‌র
মুমিন বলি তারে।
গায়রুল্লাহ্‌কে দু'পায়ে দলে
নবীর (ছাঃ) দেওয়া পথে
যে জন চলে আল্লাহ রাজি
আছেন তাহার সাথে।
আল্লাহ্‌র ডাকে প্রস্তুত থাকে
যে জন সর্বদায়
নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে
মুমিন বলি তায়।
মুমিন তো সেই বান্দা আল্লাহ্‌র
জীবন মরণ যিনি
আল্লাহকে ভালবাসেন
সব কিছু করে কুরবানী।
***

তীব্র প্রতিবাদ

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ বিন হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

কাষ্ঠে পোড়া কষ্টের আগুন
বুকের মাঝে জ্বলে,
নীরবে কেঁদে তাই বুকটা ভাসাই
দুই নয়নের জলে।
অত্যাচারীর অত্যাচার আর
সইছি নির্যাতন!
স্বদেশের কাছে কি পাওনা ছিল
এমন নিষ্ঠুর আচরণ?
দেশপ্রেমিক আমরা মযলূম জনতা
আজ বড়ই নির্যাতিত!
বেঁচে আছি শুধু অসহায়ের মতো
তবুও আজ আতংকিত।
ইংরেজ দিয়েছিল মোদের ওহাবী খেতাব
সৈয়দ নেছার আলী তিতুমীরের যুগে,
ভাই হারিয়ে ভারতবর্ষ জয় করেছিলাম
বাংলার স্বাধীনতা পাব বলে।
পূর্ব বাংলাও জয় করেছি মোরা
অনেক রক্ত সংগ্রাম স্লোগানে,
জন্মভূমির মাটি খাঁটি রেখেছি সর্বদা
মোদের প্রাণে প্রাণে।
অথচ আমাদেরকেই বল আজ দেশদ্রোহী
জঙ্গীবাদের মিথ্যা অপবাদ চাপাও উপরে
অপরাধীদের শাস্তি হ'লেও নিরপরাধ ব্যক্তি কেন
কারাগারে আজও আহাজারী করে?
আমরা যদি দেশদ্রোহী হই
সত্যিকার দেশপ্রেমিক পাবে কোথায় খুঁজে
আমরাই প্রকৃত দেশপ্রেমিক
থাকি এই বাংলার মাঝে।
কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী নির্দ্বিধায় মানি
এটাই মোদের অপরাধ,
জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এই বাংলায় সর্বপ্রথম,
আমরাই করেছি তীব্র প্রতিবাদ।
***

নগ্নতার সুর

- মুহাম্মাদ ক্বামারুযযামান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

নগ্নতার সুর কত যে মধুর
তবু যে তৃপ্তি নাহি মেটায়
ক্ষণিকের তরে একটু সুখ দিয়ে
মনের মাঝে অশান্তির দাবানল জ্বালায়।
কিছুকাল আগে ঘুম থেকে জেগে
শুনিতাম মুসলিম ঘরে কুরআনের বাণী
আধুনিক যুগে জাগার আগেই
কানে ভেসে আসে নগ্ন গানের ধ্বনী।
শিশুদের পবিত্র মুখে
কেন শুনি আজ নগ্ন গানের সুর
কিসের টানে সত্যের পথ ভুলে
যায় চলে যায় বহুদূর।
শিশুদের মাঝে লুকিয়ে রয়েছে
সুপ্ত প্রতিভার খনি
আদর, স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে
শিখাওনা কেন তাদের পবিত্র বাণী?
ফিরে এসো নগ্নতা থেকে
বাঁচাও সংস্কৃতি সভ্যতা
এই সুন্দর ভুবনের সবখানে
ছড়িয়ে দাও অহি-র সুমহান বার্তা।
***

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (শিক্ষা সংক্রান্ত)-এর সঠিক উত্তর

১। মান্দারিন।
২। ইন্দোইউরোপীয়।
৩। পঞ্চম।
৪। আরবী।
৫। প্রায় আড়াই হাযারের উর্ধ্বে।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। ৩৭° সে. ২। লৌহ ৩। ভিটামিন 'কে'
৪। টমেটোতে ৫। পাকা আমে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ধাঁধাঁ)

১। কাঁচাতে কাচ বরণ সর্বলোকে খায়,
পাকাতে সোনার বরণ গড়াগড়ি যায়।

২। কাল গরু কাল শিরে,
দুধ দেয় সাত সের।
যখন গরু মনে করে,
সাতশ নদী এক করে।

৩। বিধাতার নির্মাণ ঘর নাহিক দুয়ার
তাহাতে পুরুষ এক বসে নিরাহার।
যখন পুরুষ বড় হয়, হয় বলবান
বিধাতার ঘর ভেঙ্গে করে খন খান।

৪। এক রূপে দুই ভাই বসে দুই দেশে
পরিচয়-পরিচিতি নেই জন্মের বয়সে।
ও চলিতে এই চলে তার পিছে পিছে
দেখা দেখি নেই যদিও থাকে কাছে কাছে॥

৫। দোল দোল দোলানি
ছোট বেলার খেলনি
পাকলে সুন্দর হয়
ল্যাংটা হয়ে হাটে যায়।

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ইসলামী দল বিষয়ক)

১। ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহ কতটি ফের্কায় বিভক্ত হবে। তন্মমধ্যে কতটি জান্নাতী ও কতটি জাহান্নামী হবে?
২। খ্যাতনামা তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহঃ) জান্নাতী দল সম্পর্কে কি বলেছেন?
৩। আহলেহাদীছ জাম'আতের প্রথম সারির সম্মানিত দল কোনটি?
৪। প্রসিদ্ধ ইমাম চতুষ্ঠয় সহ বড় বড় মনীষী কোন জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন?
৫। আহলেহাদীছদের নিকট শরী'আতের উৎস কি?

** সংগ্রহেঃ আহমাদ সাঈদ আল-আশিক*
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ক্যাম্পাস।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

নাছিরাবাদ, ঢাকা ৪ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য সকাল সাড়ে ৮-টায় নাছিরাবাদ উত্তরপাড়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা মুজীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ। তিনি সোনামণি'র গুণাবলী ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি হুসাইন আল-মাহমূদ, সাধারণ সম্পাদক রেযাউল করীম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল যথাক্রমে হাফেয হাফীযুর রহমান, মুহাম্মাদ আহসানুর রাকীব, আমীনুল ইসলাম, আবু সাঈদ শাহীন, মেহেদী আরীফ, জাবিদ ইকবাল, জাহিদুল ইসলাম (১), জাহিদুল ইসলাম (২), শাহিনুর রহমান, সি. টি. কলেজ-এর মুনীরুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সানজিদা আক্তার রিয়া এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মাহমূদা আখতার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আল-আমীন।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৩ এপ্রিল বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর সোনামণি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া শাখা দায়িত্বশীলদেরকে নিয়ে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি দায়িত্বশীলদেরকে সূরা আছরের উপরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল কাফী ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি সাইফুল্লাহ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মারকায শাখার সোনামণি পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বাংলাদেশী বিজ্ঞানীর শ্যাওলা থেকে জ্বালানি উৎপাদন

জ্বালানির বিকল্প হিসাবে গম, ভুট্টা, যব থেকে ইথানল উৎপাদনের ফলে প্রচুর খাদ্য ধ্বংস করা হচ্ছে। এজন্য আবাদি জমি ব্যবহৃত হচ্ছে জ্বালানি উৎস হিসাবে। শ্রম-অর্থও ব্যয় হচ্ছে বিপুল পরিমাণে। সঙ্গে পরিবেশও দূষণমুক্ত রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থা থেকে মানব সম্প্রদায়কে অব্যাহতি প্রদানের অভিপ্রায়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীদের একটি দল। সাধনায় কি-না হয় তারই প্রমাণ হাযির করলেন এ বিজ্ঞানী দলটি শ্যাওলা বা শৈবাল থেকে ইথানলের বিকল্প তেল তৈরীর মাধ্যমে। এজন্য প্রয়োজন হচ্ছে শুধুমাত্র সূর্যের আলো আর বাতাস।

উক্ত বিজ্ঞানী দলের অন্যতম সদস্য ভার্জিনিয়ায় ওল্ড ডমিনিয়ান ইউনিভার্সিটির গবেষণা বিভাগের প্রধান বাংলাদেশী বিজ্ঞানী ডঃ আতাউল করীম বলেন, কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদির সংমিশ্রণে ফসিল ওয়েল তৈরী করা হচ্ছে। সম্প্রতি ভুট্টা, গম বা যব থেকে ইথানল তৈরীর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। কিন্তু ইথানলের জন্য মানুষের খাদ্য ধ্বংস হচ্ছে। ব্যয় হচ্ছে প্রচুর অর্থ। তিনি বলেন, আমাদের শ্যাওলার জন্য তেমন কোন ব্যয় হবে না। গম, ভুট্টা বা যব থেকে ইথানল উৎপাদনে যত ব্যয় হচ্ছে তার চেয়ে ৪০ গুণ কম ব্যয় হবে শ্যাওলা থেকে জ্বালানি উৎপাদনে। কৃষি জমিও মানুষের খাদ্যের জন্যই ব্যবহৃত হবে। উল্লেখ্য, বিশ্বের ১০১ জন সেরা বিজ্ঞানীর একজন হিসাবে ইতিমধ্যেই পরিচিতি পেয়েছেন ডঃ করীম।

৪৩ বছর পর ঢাকা-কলকাতা ট্রেন চলাচল শুরু

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের এক নতুন দুয়ার খোলার প্রত্যাশায় বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে গত ১৪ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৮-টায় ৩৭৬ জন যাত্রী নিয়ে ঢাকা থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে দু'দেশের মধ্যে সেতুবন্ধনকারী নতুন ট্রেন সার্ভিস 'মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন'। ৪৩ বছর পর দু'দেশের মধ্যে চালু হওয়া এই ট্রেন সার্ভিস বয়সের ভারে যারা নুইয়ে পড়েছে তাদের নিয়ে যায় শৈশব আর কৈশোরের স্মৃতির ভুবনে। আর নতুন প্রজন্মের কাছে এ যেন নব আশার আলো ছড়ানোর মত। ঐদিন মৈত্রী এক্সপ্রেস চালুর শুভ মুহূর্তে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টা, বিদেশী দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতগণ, দাতা সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগাযোগ উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবঃ) গোলাম কাদের বলেন, 'নববর্ষের শুভদিনে মৈত্রী ট্রেনের শুভ উদ্বোধনের কাজটি করতে পেরেছি। এর ফলে দু'দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন হবে। সার্ক দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ বাড়বে'। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, 'এটি একটি ঐতিহাসিক দিন। এই রেলবন্ধনকে উপলক্ষ করে আজ উভয় বাংলার মানুষ উৎসব মুখর'। পহেলা বৈশাখের ভোরে মৈত্রী এক্সপ্রেসকে স্বাগত জানাতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশনে ভিড় জমেছিল হাযারো মানুষের। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশন থেকে দর্শনা পর্যন্ত প্রতিটি ষ্টেশনে শত শত মানুষের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। ট্রেনটিকে স্বাগত জানানোর অপেক্ষায় ছিলেন তারা। দর্শনা রেল ষ্টেশনে হাযির হয়েছিল কয়েক হাযার মানুষ।

অন্যদিকে মৈত্রী এক্সপ্রেস কলকাতা থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে ছাড়ার আগে সেখানে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব বলেন, 'বাংলাদেশ-ভারত ভৌগলিকভাবে আলাদা হ'লেও দু'দেশের মানুষের হৃদয় আলাদা হয়নি'।

উল্লেখ্য, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর ঢাকা-কলকাতা সরাসরি ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ৪৩ বছর পর আবার ট্রেন চলাচল শুরু হ'ল। ঢাকা থেকে কলকাতা পর্যন্ত দূরত্ব হ'ল মোট ৪০৫ কিলোমিটার। সপ্তাহে ২দিন শনি ও রবিবার এই ট্রেন চলবে। সময় লাগবে ১৩ ঘণ্টা। মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনে ৩টি শ্রেণী থাকবে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রথম শ্রেণী (কেবিন), ভাড়া ১৪০০ টাকা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (চেয়ার) ভাড়া ৮৪০ টাকা এবং শোভন (চেয়ার) ভাড়া ৫৬০ টাকা। এছাড়া টিকিটের সাথে ৩০০ টাকা ভ্রমণ কর পরিশোধ করতে হবে। ৫ বছর পর্যন্ত যে কোন শিশু যে কোন শ্রেণীতে ৫০ ভাগ ভাড়ায় ভ্রমণ করতে পারবে। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক যাত্রী ২টি লাগেজে সর্বোচ্চ ৩৫ কেজি এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক যাত্রী ২০ কেজি মালামাল বিনা মাশুলে বহন করতে পারবে।

জাতীয় পরিচয়পত্র জাল করলে ৭ বছর জেল

জাতীয় পরিচয়পত্র জাল করার ক্ষেত্রে অন্যূন ৭ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রেখে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ-২০০৮ এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে সরকার। এছাড়াও কেউ একাধিক পরিচয়পত্র বহন করলে কিংবা মিথ্যা তথ্য দিলে সেক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে তিন মাসের জেলসহ অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। গত ৩০ মার্চ প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ফখরুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের নিয়মিত বৈঠকে অধ্যাদেশটির অনুমোদন দেয়া হয়। বৈঠকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ সহ 'স্পেশাল এসিস্ট্যান্ট টু চীফ এডভাইজার'বৃন্দ অংশ নেন।

অভাবের তাড়নায়...

(ক) ক্ষুধার জ্বালায় গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যার চেষ্টাঃ

ক্ষুধার জ্বালায় গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করে মারাত্মক দগ্ধ হয়েছে নওগাঁর এক কিশোরী। জানা যায়, নওগাঁর মহাদেবপুর উপযেলার কালু শহর গ্রামের দরিদ্র ভ্যানচালক আইয়ুব আলীর কন্যা ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী সাথী ক্ষুধার তাড়নায় গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। সাথীর পিতা আইয়ুব আলী জানান, গত ৮ এপ্রিল চাল কিনতে না পারায় ঐ দিন বাড়ীতে চুলা জ্বলেনি। আগের দিন দুপুর থেকে না খেয়ে থাকা সাথী মঙ্গলবার বিদ্যালয় থেকে ফিরে এসেও ভাত না পেয়ে ঘরে থাকা কেরোসিন গায়ে ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

Contents

(খ) পেট ভরে খেতে দিন, না হয় বিষ কেনার পয়সা দিনঃ

ভিক্ষে চাই না, পেট ভরে খেতে চাই। আজ ২/৩ দিন ধরে পেটে ভাত পড়েনি। রুটি-মুড়ি খেয়ে দিন কাটাচ্ছি। তাই ভাত খাবার জন্য টাকা চাই। যদি তা না দিতে পারেন তবে বিষ কেনার পয়সা দিন। খেয়ে মরে যাই। তাহ'লে আর সাহায্য নিতে আসব না, আপনাদের বিরক্ত করব না। অশ্রুসিক্ত নয়নে এ কথাগুলো বলেন সিরাজগঞ্জ সদর উপযেলার গুনেরগাতি গ্রামের মৃত আফসার আলীর স্ত্রী শরিফন বেওয়া (৭০)।

(গ) তিন সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়ার চেষ্টাঃ

চট্টগ্রাম যেলার মীরসরাই উপযেলার ৭নং কাটাছরা ইউনিয়নের মাচ্ছাপুকুর গ্রামে অভাবের তাড়নায় নিজের ৩ সন্তানকে গভীর রাতে গর্ত করে পুঁতে ফেলার চেষ্টা করে এক গরীব দিনমজুর। মাচ্ছাপুকুর গ্রামের লোকজন জানান, দিনমজুর আযীযুল হক (৪০) কয়েকদিন যাবত কাজের সন্ধানে বিভিন্ন স্থানে ধর্ণা দেয়। কিন্তু কাজ মেলেনি। ছেলেমেয়েদের খাবার যোগাড় করতে না পেরে গত ৮ এপ্রিল দিবাগত রাত ১২-টার দিকে ঘরের পেছনে একটি গর্ত করে তারপর ৩ ছেলেমেয়েকে প্রস্রাব করতে ডেকে নিয়ে গিয়ে 'তোদের আল্লাহ্‌র কাছে সপে দিলাম' বলে দুই ছেলে ইকবাল হোসাইন (১২), এমরান হোসাইন (৮) ও কন্যা ফারিয়া আক্তার (৫)-কে জোর করে গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু দু'ছেলে চিৎকার করে কান্না করতে থাকলে বাড়ীর লোকজন ছুটে এসে তিন সন্তানকে উদ্ধার করে। আযীযের বড় ভাই রেযাউল করীম ও ছোট ভাই আবুল হোসাইন জানায়, অভাবের তাড়নায় সে এই ঘটনা ঘটাতে চেষ্টা করে।

(ঘ) ক্ষুধার জালায় পিতা কর্তৃক সন্তান হত্যাঃ

এদিকে একই কারণে গত ১৭ এপ্রিল রাজশাহীর পুঠিয়ার ডাসমারিয়া গ্রামের এক দিনমজুর তার দুই শিশু কন্যাকে হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করে। এরা হ'ল দেড় বছরের রেহেনা ও ৪ বছরের সোহানা।

এলাকাবাসী জানায়, দিনমজুর বাবলু দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে খুবই কষ্টে দিনাতিপাত করে আসছিলেন। ঐ দিন সকাল ১০-টার দিকে দুই শিশু কন্যাকে মিষ্টি কিনে দেয়ার কথা বলে বাবলু বাড়ির অদূরে নিয়ে তাদের গামছা পেঁচিয়ে পুকুরে ফেলে দেয়। পরে সে নিজেও বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। এলাকাবাসী মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।

সরকারী দপ্তরে দুর্নীতি আগের চেয়ে বেড়েছে

বর্তমান সরকারের চলমান দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে বড় পর্যায়ের কিছুসংখ্যক দুর্নীতিবাজ ধরা পড়লেও মাঠ পর্যায়ে দুর্নীতি মোটেই কমেনি। বিশেষ করে সরকারী দপ্তরগুলোর ৯৮ শতাংশ প্রতিষ্ঠানেই দুর্নীতি আরো শেকড় গেড়ে বসেছে। এর মধ্যে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক কার্যালয়সমূহ ভূমি, তহশিলদার অফিস, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), এনজিও ফাউন্ডেশন সহ বিভিন্ন দপ্তরে ঘুষের রাজত্ব চলছে দাপটের সাথে। 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' (টিআইবি)'র ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুযাফফর আহমাদ একথা জানান। তিনি বলেন, বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর জরিপ চালিয়ে টিআইবি দেখেছে, বর্তমান সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের পরও ২০০৭ সালে মাঠ পর্যায়ে দুর্নীতি কমেনি। বরং বেড়েছে ঘুষ লেনদেনের পরিমাণ। দুর্নীতি দমন কমিশন বড় বড় দুর্নীতি নিয়ে কাজ করছে। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে দুর্নীতি তেমন কমেনি।

টিআইবির জরিপে পাওয়া তথ্যে দেখা গেছে, ২০০৭ সালে সরকারের নিম্ন পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সাধারণ মানুষকে আগের চেয়ে বেশী ভোগান্তির শিকার হ'তে হয়েছে। ঘুষের পরিমাণও বেড়েছে।

দেশের ৬০ ভাগ মানুষ এখনো স্বাস্থ্যসেবা পায় না

দেশের ৬০ ভাগ মানুষ এখনো স্বাস্থ্যসেবা পায় না। আর ৫৪ দশমিক ৮ ভাগ মানুষ তাদের এই অধিকার সম্পর্কে জানে না। দেশের তিন হাযার ১৬৯ জনের জন্য আছেন মাত্র একজন চিকিৎসক। আর ২ হাযার ৫৭১ জনের জন্য বরাদ্দ আছে হাসপাতালের একটি মাত্র বেড। স্বাস্থ্যখাতে এ দেশের মানুষের মাথাপিছু ব্যয় ১৮২ টাকা। রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য বর্তমানে দেশে মোট রেজিষ্টার্ড ডেন্টাল সার্জন আছেন ২ হাযার ৩৪৪ জন। স্বাস্থ্য বিষয়ে বেসরকারী এক গবেষণায় এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

৫০ বছর ধরে ভাত খান না শহীদ মিঞা!

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী মুহাম্মাদ শহীদ মিঞা (৬২) গত ৫০ বছর ধরে ভাত খান না। শৈশবে অভাব ও ইয়াতীম অবস্থায় বেড়ে উঠায় বাধ্য হয়ে হোটেল-রেষ্টুরেন্টের আটার রুটিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তিন বেলায়ই তিনি আটার রুটি খান। ভাতের গন্ধ তিনি সহ্য করতে পারেন না। বর্তমানে আটার দাম বেড়ে যাওয়ায় কষ্টে আছেন তিনি। স্বাধীনতার আগে তিনি বিয়ে করলে স্ত্রী ভাত খাওয়াতে অনেক চেষ্টা করেন। বর্তমানে অবসরে তিন হাযার টাকা করে ভাতা পান। কিন্তু তার ছেলে, তাদের সন্তানাদি ও দু'মেয়ের লেখা-পড়ার খরচ বহন করতে কষ্ট হচ্ছে। তার দেখাদেখি তার পরিবারের অনেকেই আটার রুটিতে অভ্যস্ত হওয়ায় তার খরচ আরো বেড়ে গেছে।

Contents

বিদেশ

খাদ্যের জন্য বিশ্বে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে

খাদ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং খাদ্য ঘাটতি সারা দুনিয়ার জন্য বিপজ্জনক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এ মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ বলেছে, খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির এই সংকট বিশ্বে ভয়াবহ যুদ্ধের আশংকার সৃষ্টি করতে পারে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় আইএমএফ বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। আইএমএফের মহাপরিচালক ডোমিনিক স্ট্রাউস কাহন গত ১৩ এপ্রিল ওয়াশিংটনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, খাদ্যপণ্যের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি বিশ্ববাসীর জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে। একই সংবাদ সম্মেলনে আইএমএফের শীর্ষস্থানীয় নীতিনির্ধারণী সংস্থা আন্তর্জাতিক মুদ্রা ও অর্থ সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান টোমাসো পাদুয়া স্কিওপা বলেন, চলমান খাদ্য সংকটটি যেহেতু একটি বৈশ্বিক সংকট, সেকারণ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমেই এ সংকট মোকাবিলা করতে হবে এবং একই সাথে সংকট উত্তরণে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর ভূমিকা জোরদার করতে হবে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে দুনিয়ার নিরন্ন মানুষের জন্য অবিলম্বে খাদ্য সাহায্য প্রদানের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রধান রবার্ট জিওলিক হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি দরিদ্র বিশ্বের দেশগুলোতে চরম রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্ম দেবে। উদ্ভূত সংকট মোকাবিলায় তিনি বিশ্বের প্রায় সর্বত্র সৃষ্ট খাদ্যসংকট দূরীকরণে নতুন উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। এদিকে খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে দেশব্যাপী রক্তাক্ত দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষাপটে হাইতির প্রধানমন্ত্রী জ্যাকুয়েস এডোয়ার্ড আলেক্সিসকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

১০ কোটি লোক অনাহারে মারা যেতে পারেঃ বিশ্বব্যাংক থেকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে পশ্চাৎপদ দেশগুলোর অন্তত ১০ কোটি মানুষ কঠিন দারিদ্র্যে নিপতিত হবে এবং চরম খাদ্যাভাবে মৃত্যুর ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। বর্তমান সময়ের ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবিলায় তথা নিরন্ন মানুষের মুখের খাবার উৎপাদনে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট জিওলিক সর্বাধিক বিনিয়োগের জন্য বিশ্বের ধনী দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়াও যরূরী খাদ্যাভাব মোকাবিলায় তিনি অবিলম্বে ৫০ কোটি ডলার মূল্যের খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

দুর্নীতির অভিযোগে থাই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ

থাইল্যান্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী অবশেষে গত ৯ এপ্রিল পদত্যাগ করেছেন। স্ত্রীর শেয়ার সংক্রান্ত সম্পদের হিসাব প্রদানে ব্যর্থতার দায় নিয়ে সৃষ্ট দুর্নীতির অভিযোগে শেষ পর্যন্ত তিনি পদত্যাগ করে মুখরক্ষা করলেন। থাইল্যান্ডের জাতীয় দুর্নীতি দমন কমিশন জানিয়েছে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছাইয়া সাসোমপুর সম্পদের বিবরণী দাখিল সংক্রান্ত আইনের বিধি লংঘন করেছেন এবং এ কারণে তাকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানানো হয়। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করে পদত্যাগের পরিকল্পনা নাকচ করে দেন। এ বিধির অধীনে মন্ত্রীসভার যে কোন সদস্যের দায়িত্ব গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে তার ব্যক্তিগত, তার স্ত্রী কিংবা স্বামী অথবা তার সন্তানদের সম্পদের বিবরণী দাখিল করার বিধান রয়েছে। এছাড়া এ আইনের অধীনে সরকারী কর্মকর্তা এবং তাদের নিকটতম পারিবারিক সদস্যরা কোন কোম্পানীর সম্পদের শতকরা ৫ ভাগের বেশী শেয়ার অর্জন করতে পারবেন না। ছাইয়া ফেব্রুয়ারী মাসের ৬ তারীখে মন্ত্রীসভার সদস্য হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, তার স্ত্রীর সম্পদের বিবরণী দাখিল সংক্রান্ত বিধি সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন না এবং তিনি নির্দিষ্ট সময়ের পরে তার সম্পদের প্রতিবেদন দাখিল করেন। ব্যাংকক পোষ্ট জানায়, ছাইয়ার স্ত্রী সরাইয়ের ৮০ হাযার ডলারের সম্পদের সমপরিমাণ কোন একটি কোম্পানীর ২৫ হাযার শেয়ার রয়েছে।

ব্রিটিশ ভিসা পেতে জালিয়াতির আশ্রয় নিলে ১০ বছরের নিষেধাজ্ঞা

যুক্তরাজ্যে গত ১ এপ্রিল থেকে নতুন ভিসা আইন চালু হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী ব্রিটিশ ভিসা পেতে কেউ যদি জালিয়াতির আশ্রয় নেন কিংবা ভুয়া তথ্য প্রদান করেন, তাহ'লে পরবর্তী ১০ বছরের জন্য তিনি আর ব্রিটিশ ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন না। ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশনের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে একথা বলা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, এই আইন চালু করার জন্য অভিবাসন আইনে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং গত ১ এপ্রিল থেকে বিশ্বের সব দেশে চালু হয়েছে। পরিবর্তিত আইন অনুযায়ী অতীতে যারা অভিবাসন আইন ভঙ্গ করে যুক্তরাজ্যে অবৈধভাবে অবস্থান করেছেন কিংবা বিনা অনুমতিতে কোন কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তাদেরও আর ভিসা দেয়া হবে না।

কারাভোগের ক্ষতিপূরণ

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা রাজ্য বিভিন্ন অপরাধে ভুলবশতঃ দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ডপ্রাপ্ত ৪৬ বছরের এক লোককে ১০ এপ্রিল ১২ লাখ ৫০ হাযার মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। ২০০৬ সালে ডিএনএ পরীক্ষার ভিত্তিতে অপরাধের দায় থেকে অব্যাহতি দেয়ার পূর্বে তিনি ২৪ বছর কারাগারে কাটান। জেরম এ্যালান ক্রোটজারের ক্ষতিপূরণ হিসাবে একটি আদেশে স্বাক্ষরের পর গভর্ণর চার্লি ক্রিষ্ট বলেন, 'কারাগারে এ্যালান যে সময় হারিয়েছেন তা ডলার দিয়ে পূরণ হবার নয়'।

Contents

স্ত্রীরাও অপরাধী!

ভারতের মুম্বাই হাইকোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে বলেছেন, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী কর্মকর্তাদের স্ত্রীরাও আইনের চোখে সমানভাবে দায়ী হবেন, যদি তাঁরা স্বামীর বেআইনিভাবে অর্জিত সম্পত্তির সুখ-সুবিধা ভোগ করেন। মুম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি ভি আর কিঙ্গায়োনকর গত ৯ এপ্রিল এই রায় দেন। আয়ের সঙ্গে সংগতিহীন সম্পত্তির একটি মামলায় এক সরকারী কর্মকর্তার স্ত্রীকে সমানভাবে দোষী সাব্যস্ত করেন আদালত। ঐ সরকারী কর্মকর্তা তাঁর বেআইনিভাবে অর্জিত সম্পত্তির একটি বড় অংশ স্ত্রীর নামে রেখেছিলেন। ঐ মামলায় নিম্ন আদালত স্ত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং দুই লাখ রূপী জরিমানা করেন।

মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় পানির পরিমাণ ২০৫০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নেমে আসবে

ভবিষ্যতে পানির সংকট এড়াতে হ'লে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোকে বিপুল লগ্নি করতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংক তাদের নতুন একটি প্রতিবেদনে বলেছে, বিশ্বের ঐ অঞ্চলটি এমনিতেই শুষ্ক। কিন্তু জলবায়ুর পরিবর্তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে সেখানে মাথাপিছু যতটা পানি পাওয়া যায় তার পরিমাণ অর্ধেকে নেমে যাবে। বিশ্বব্যাংক এই কারণে ঐ অঞ্চলের দেশগুলোর প্রতি আর্জি জানিয়ে বলেছে, পানির অপচয় বন্ধ করার জন্য তারা যেন এখনি ব্যবস্থা নেন এবং পানি সরবরাহের জন্য সাশ্রয়কর পদ্ধতি ও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন।

প্রতিকূল পরিবেশের জন্যই খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে

সারা বিশ্বে লাখ লাখ মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা এখন ঝুঁকির মধ্যে। অতিরিক্ত মৎস্য শিকার, জলবায়ুর পরিবর্তন ও দূষণের কারণে সাগর ও মহাসাগরগুলোর ক্ষতি হওয়ায় খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। গত ১১ এপ্রিল ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে সমাপ্ত সমুদ্রবিজ্ঞানীদের এক সম্মেলনে এ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়। সমুদ্রবিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ হচ্ছে পানি এবং এই পানির মাছ থেকে বিশ্বের পাঁচ ভাগের এক ভাগ প্রোটিন আসে। কিন্তু এখন মোট মাছের ৭৫ শতাংশই শিকার হয়ে যায়। সমুদ্রের উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ায় প্রবালের ক্ষয় হচ্ছে, শৈবালের বংশবৃদ্ধি ঘটছে এবং সমুদ্রপ্রবাহের দিক পাল্টে যাচ্ছে। এসবের প্রভাব পড়ছে আবহাওয়ার উপর। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার কারণে বাংলাদেশ থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকা ভবিষ্যতে হুমকির মুখে পড়বে।

ইরাক ও আফগান যুদ্ধ ফেরত মার্কিন সেনা সদস্যদের ২০ শতাংশ মানসিক রোগের শিকার

ইরাক ও আফগান যুদ্ধ ফেরত প্রায় ২০ শতাংশ মার্কিন সৈন্য বর্তমানে মানসিক চাপজনিত রোগে ভুগছে। গত ১৭ এপ্রিল প্রকাশিত এক রিপোর্টে এই তথ্য পাওয়া গেছে। চাকরিতে নিয়োজিত ও সাবেক সেনা সদস্যদের উপর পরিচালিত ব্যাপক ও সর্বশেষ এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ইরাক ও আফগান যুদ্ধ ফেরত তিন লাখের মধ্যে অর্ধেকের কম মার্কিন সেনাকে মানসিক চাপজনিত রোগের চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, মানসিক অবসাদজনিত রোগ ইতিপূর্বে যেভাবে জানা ছিল তারচেয়ে অনেক বেশী প্রভাবশালী ও দীর্ঘস্থায়ী হ'তে পারে। অন্যদিকে ইরাক ও আফগানিস্তানে মোতায়েন ১৬ লাখ ৫০ হাযার সেনা সদস্যের মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার উপর এটিই প্রথম সমীক্ষা।

ভারতে কৃত্রিম হৃদযন্ত্র স্থাপনে কৃতিত্ব

ভারতের একটি হাসপাতালের চিকিৎসকেরা ৫৪ বছর বয়সী ভেঙ্কটকৃষ্ণা নামের এক রোগীর দেহে সফলভাবে কৃত্রিম হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন করেছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দাবি করেছেন, এর আগে এশিয়ার কোন দেশে এমন জটিল অস্ত্রোপচার ও কৃত্রিম হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন করা হয়নি। বেঙ্গালুরের নারায়ণ হৃদয়ালয় হাসপাতালে গত ২০ মার্চ ঐ অস্ত্রোপচার করা হয়। হাসপাতালের চেয়ারম্যান দেবী শেঠি বলেন, হাসপাতালের একজন চিকিৎসক টানা চার ঘণ্টা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ঐ রোগীর দেহে কৃত্রিম হৃদযন্ত্র 'ভেন্ট্রিকুলার এসিষ্ট ডিভাইস' বা ভিএডি প্রতিস্থাপন করেন। একজন মার্কিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অস্প্রোপচারের কাজে তদারক করেন। শেঠি আরও জানান, ২ দশমিক ৪ ইঞ্চি ব্যাসের এবং ২৯৮ গ্রাম ওযনের ঐ ভিএডি যন্ত্রটি বুকের নিম্নাংশে হৃৎপিণ্ডের নীচে বসানো হয়েছে। যন্ত্রটিকে প্রতি বার ঘণ্টা পর চার্জ দিতে হবে। আর এজন্য বাইরের ব্যাটারির সঙ্গে এর কেবল সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ভিএডি যন্ত্র একটি সাধারণ বহির্মুখী পাম্প যন্ত্রের মতো। এটি হৃৎপিণ্ড থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত শোষণ করে সেগুলো হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকে ও ধমনীতে ছড়িয়ে দিবে। যন্ত্রটি স্বাভাবিক হৃদযন্ত্রের চেয়েও শক্তিশালী। কারণ স্বাভাবিক হৃদযন্ত্র চাঁর থেকে পাঁচ লিটার রক্ত সঞ্চালন করতে পারে। কিন্তু ভিএডি প্রতি মিনিটে ১০ লিটার রক্ত সঞ্চালন করবে।

চেয়ারম্যান শেঠি দাবী করেন যে, গত আট বছর ইউরোপ ও আমেরিকার চিকিৎসকেরা নতুন প্রজন্মের এই কৃত্রিম হৃদৎযন্ত্রটি সফলভাবে রোগীর দেহে প্রতিস্থাপন করেছেন। ঐ সময়ে মোট ২২০ জনের দেহে এটি বসানো হয়েছে। কিন্তু এশিয়ার কোন দেশে এটিই প্রথম এ ধরনের অস্ত্রোপচার।

মুসলিম জাহান

৯২ লাখ পাউন্ডে কা'বা শরীফের চাবি বিক্রি

দ্বাদশ শতাব্দীর তৈরী পবিত্র কা'বা শরীফের একটি চাবি বিক্রি হ'ল রেকর্ড মূল্যে প্রায় ৯২ লাখ পাউন্ডে। এ পর্যন্ত বিক্রিত ইসলামী শিল্প নিদর্শনগুলোর মধ্যে এই চাবিটি সর্বোচ্চ রেকর্ড মূল্যে বিক্রি হ'ল। লন্ডনের সোদবির একটি নিলাম হাউসে এটি বিক্রি হয়েছে। আব্বাসী আমলের তৈরী এই চাবিটি লোহার এবং এটি ৩৭ সেন্টিমিটার লম্বা। অজ্ঞাতনামা এক ক্রেতা এটি ক্রয় করেন। চাবির গায়ে খোদাই করে লেখা রয়েছে, 'এই চাবিটি ৫৭৩ হিজরীতে আল-মুকতাদী আবু জা'ফর আল-মুসতানছির আবুল আব্বাসের সময়ে তৈরী করা হয়েছে পবিত্র কা'বা শরীফের জন্য'।

উচ্চশিক্ষায় বিশ্বে সঊদী আরব ৭ম

উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় বিশ্বের ৩০টি উন্নত দেশের মধ্যে সঊদী আরব ৭ম স্থান অধিকার করেছে। এক্ষেত্রে দেশটি ফ্রান্স, হল্যান্ড, গ্রীক, স্পেন, রাশিয়া, মিসর, জাপান, ইতালী, পোল্যান্ড, মালয়েশিয়া এবং ইউক্রেনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। ব্রিটেনের একটি পত্রিকার রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, বিশ্বের খ্যাতনামা ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচী তৈরী করা হ'লে সঊদী আরবের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় তালিকায় স্থান পায়। ছাত্রদের প্রতি মাথাপিছু ব্যয় এবং শিক্ষা খাতে বরাদ্দের প্রতিও জরিপে খেয়াল রাখা হয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে সঊদী আরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০টি।

[সৌজন্যেঃ উর্দূ মাসিক মা'আরিফ, আযমগড়, ভারত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২০৩]

২০১৫ সালে পাকিস্তানে অশিক্ষিত যুবকদের সংখ্যা হবে ৫২ মিলিয়ন

পাকিস্তানে 'ইউনেস্কো'র তত্ত্বাবধানে 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক এক সেমিনারে এই দুঃখজনক রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে যে, সেখানকার যুবকদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি ঝোঁক অত্যন্ত কম এবং পাকিস্তানী যুবকদের অর্ধেক অশিক্ষিত। উক্ত সেমিনারে সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে এ আশংকাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এ বিপদজনক পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি না দিলে ২০১৫ সাল নাগাদ পাকিস্তানে অশিক্ষিত যুবকদের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫২ মিলিয়নে। উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তানে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার হার সবচেয়ে কম অর্থাৎ ৫৩%। *[ঐ, পৃঃ ২০১]*

মোসাদ ৩০০ ইরাকী বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছে

ইসরাঈলী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ' মার্কিন সেনাবাহিনীর সহায়তায় পরমাণু অস্ত্র তৈরীতে পারদর্শী ৩০০ ইরাকী বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছে। তাছাড়া বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী ২০০ বিজ্ঞানীকে তারা বন্দী করেছে। ইরাকের প্রযুক্তিগত উন্নতি-অগ্রগতি সাধন এবং আমেরিকান বিজ্ঞান গবেষণাগার সমূহে কাজ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করাই তাদের অপরাধ। আমেরিকান পররাষ্ট্র দপ্তরের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, আরো প্রায় ১০০০ হাযার ইরাকী বিজ্ঞানী 'মোসাদ'-এর শ্যেনদৃষ্টিতে আছে। বিশ্লেষকদের মতে, ইরাকী বিজ্ঞানীদেরকে হত্যা করার মাধ্যমে ইরাককে বিজ্ঞানীশূন্য করাই তাদের উদ্দেশ্য। যাতে ইরাকীরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে না পারে। *[ঐ, পৃঃ ২০২]*

পাকিস্তানে দূরপাল্লার ব্যালেষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা

পাকিস্তান গত ১৯ এপ্রিল পারমাণবিক ওয়ারহেড বহনে সক্ষম একটি দূরপাল্লার ব্যালেষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে। সামরিক মুখপাত্র মেজর জেনারেল আতাহার আব্বাস জানান, একটি অজ্ঞাত স্থান থেকে দুই হাযার কিলোমিটার পাল্লার শাহীন-২ নামের এই ক্ষেপণাস্ত্রটির পরীক্ষা চালানো হয়। এটি প্রচলিত ও অপ্রচলিত ওয়ারহেড বহনে সক্ষম। সামরিক বাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানী এই ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা প্রত্যক্ষ করেন। এ সময় তিনি দক্ষিণ এশিয়ায় একটি টেকসই কৌশলগত ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে এই ধরনের সাফল্য অর্জন করায় বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলীদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, তার সরকার প্রতিরক্ষা প্রয়োজনীয়তাকে সবচেয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

উল্লেখ্য, ফেব্রুয়ারী মাসের নির্বাচনের পর সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর এটাই প্রথম ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা।

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

Contents

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

জন্তুর বিষ্ঠা থেকে কফি!

বুনো প্রাণী খাট্টাসের বিষ্ঠা থেকে বিচি সংগ্রহ করে তৈরী হয় বিশ্বের সবচেয়ে দামি কফি। লন্ডনের দোকানে এরকম এক কাপ কফি বিক্রি হচ্ছে ৫০ পাউন্ডে। অবিশ্বাস্য হ'লেও ব্যাপারটা সত্যি।

জ্যামাইকার ব্লু মাউন্টেন এবং কোপি লোয়াক জাতের কফি গাছের বিচি সংগ্রহ করা মানুষের পক্ষে কষ্টসাধ্য। বন বেড়ালের মতো দেখতে এক জাতের খাট্টাস গাছে উঠে এই কফির পাকা ফল খায়। খাওয়ার পর পুরোপুরি হজম হওয়ার আগেই বিচিগুলো তারা পায়খানার মাধ্যমে ত্যাগ করে। এগুলো বাগানের শ্রমিকরা সংগ্রহ করে ধুয়ে পরিষ্কার করে ভেজে নেয়। একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে ভেজে কফির মান উন্নত করা হয়। তারপর সেগুলো গুঁড়ো করে কফি পানীয় তৈরী হয়। ডেভিড কুপার নামের এক ব্যক্তি প্রথম খাট্টাসের বিষ্ঠায় থাকা কফি বিচি থেকে এই কফি তৈরী করে বাজারজাত করেন। এই কফির নাম দেয়া হয়েছে কফি রারো। বিষ্ঠা থেকে সংগৃহীত কফি বিচি বিক্রি করা হয় প্রতি কেজি ৩২৫ পাউন্ডে।

এমপিথ্রির কারণে ঝুঁকিতে কিশোর-কিশোরীরা

এমপিথ্রি প্লেয়ারে জোরে বাজানো গান শ্রবণশক্তির ক্ষতি করে। এতে করে কিশোর-কিশোরীদের বধির হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে। কিন্তু এ ঝুঁকির কথা জেনেও অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরা বুঁদ হয়ে আছে এই ক্ষতিকর নেশায়। এমপিথ্রি প্লেয়ার এবং আইপডের আওয়ায কমানোর কোন কারণ নেই বলেই মনে করে তারা। সম্প্রতি 'পেডিয়াট্রিকস' জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণার ফলে এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। গবেষকরা গবেষণার প্রতিবেদনে আরো জানিয়েছেন, অনেক কিশোর-কিশোরীর মতো ছাত্র-ছাত্রীরাও বধির হওয়ার ঝুঁকি স্বীকার করে না। তাদের বেশিরভাগই উচ্চ শব্দের সাধারণ ঝুঁকি সম্পর্কে জানে। তারা মনে করে, এতে তাদের শ্রবণশক্তির তেমন কোন ক্ষতি হবে না। এ গবেষণার প্রধান গবেষক ইনেকে ভোগেল জানান, আমরা মা-বাবাদের পরামর্শ দেব তাদের সন্তানদের এমপিথ্রি ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে জানানোর, বিশেষ করে এর পরিণতিতে তারা যে একেবারেই বধির হয়ে যেতে পারে- তা নিয়ে আলোচনা করার'।

দিনে তিন কাপ চা খেলে হার্ট এ্যাটাকের ঝুঁকি কমে

বিজ্ঞানীরা বলছেন, দিনে তিন কাপ চা খেলে হার্ট এ্যাটাক কিংবা স্ট্রোকের ঝুঁকি রুখতে সাহায্য করে। ফ্রান্সে এক দল গবেষক এ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে দেখতে পেয়েছেন, যে মহিলা দিনে তিন কাপ চা খেয়েছেন তার মেদ জমা এবং শিরায় কোলেস্টেরল বা চর্বি জমার ঝুঁকি কম। বৃটিশ সংবাদপত্র 'ডেইলী মেইল' এই রিপোর্ট দিয়েছে। অবশ্য তাদের মতে, পুরুষের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়।

প্যারিসের ইনষ্টিটিউট ন্যাশনাল দ্য লা সান্ট, এল দ্য লা রিসার্চ এমডিকেল ৭৩ বছর বয়সের ২৬১৬ জন পুরুষ এবং ৩৯৮৪ জন মহিলাকে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। পরীক্ষায় দেখা গেছে, চা পান করেন এমন মহিলার ধমনীতে চর্বি প্রবাহ ৪৫ শতাংশ। এক বা দুই কাপ চা পানকারী মহিলার চর্বির পরিমাণ ৪২.৫ শতাংশ এবং তিন বা ততোধিক কাপ চা পানকারী মহিলার চর্বির পরিমাণ ৩৩.৭ শতাংশ। উচ্চ রক্তচাপগ্রস্ত মহিলা চা পান করলে সুস্থ হয়ে উঠেন।

হার্টের রোগ উপশমে কার্যকর ডায়াবেটিস ওষুধ আবিষ্কৃত

জাপানে আবিষ্কৃত ডায়াবেটিস ওষুধ এই প্রথম হার্টের রোগ প্রশমনে সাহায্য করে। ৩১ মার্চ শিকাগোতে প্রকাশিত এক গবেষণায় এই ফলাফল পাওয়া গেছে। এতে হার্টের জটিল রোগ চিকিৎসার নতুন পন্থা উন্মুক্ত হয়ে গেল। জাপানের টাকেটা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আবিষ্কৃত 'এ্যাকটম' ওষুধটিকে ফরাসী কোম্পানী সানোফির উৎপাদিত 'আরমিল'-এর সাথে এই ওষুধের তুলনা করা হয়। ৫৪৩ জন রোগীর ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা চালিয়ে ১৮ মাসে জাপানী প্রতিষ্ঠান এই ওষুধ উদ্ভাবন করে। এ পর্যন্ত আর কোন ডায়াবেটিস ওষুধ জানামতে ধমনীর রক্ত চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি কার্যকরভাবে উপশম করেনি।

ভিটামিনে আয়ু কমতে পারে!

ভিটামিন ওষুধ থেকে সাবধান! দেহপুষ্টির রোগ প্রতিরোধের জন্য যেসব ভিটামিনযুক্ত ওষুধ প্রতিদিন খেয়ে এসেছেন তাই এখন আপনার জন্য কাল হ'তে পারে। নতুন এক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, দীর্ঘজীবনের আশায় যেসব ভিটামিনযুক্ত ওষুধ আমরা নিয়মিত খেয়ে থাকি তা আমাদের দ্রুত মৃত্যুর কারণও হ'তে পারে। বিশেষ করে ভিটামিন 'এ' এবং 'ই' এর ব্যাপারে সাবধান। কোপেনহ্যাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানীর মতে, ভিটামিন-এ এবং ই-যুক্ত ওষুধ দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় নাক গলিয়ে তাকে দুর্বল করে ফেলে। এমনকি বিটা ক্যারোটিন ভিটামিন-এ ভিটামিন-ই যুক্ত ওষুধ আপনার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে পারে। এতদিন ধরে আমরা জানি, ভিটামিন-এ চামড়া পোক্ত, দৃষ্টিশক্তি প্রখর এবং বীর্য তৈরী করে। ভিটামিন-ই রক্ত সঞ্চালন সচল রাখে, বুড়োদের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে এবং বিটা ক্যারোটিন দৃষ্টিশক্তি ভাল করে এবং মানসিক অবসাদ দূর করে। এসব ভিটামিনযুক্ত স্বাভাবিক খাবার না খেয়ে অনেকে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ওষুধের মাধ্যমে এসব ভিটামিন গ্রহণ করে আসছে। বিজ্ঞানীরা দুই লাখ ৩৩ হাযার লোককে পরীক্ষা করে এসব ভিটামিন ওষুধের ক্ষতিকর প্রভাব আবিষ্কার করেছেন। ভিটামিন-এ এর ওষুধ যারা নিয়মিত খেয়েছেন তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬ শতাংশ। বিটা ক্যারোটিনে বেড়েছে ৭ শতাংশ আর ভিটামিন ই'তে বেড়েছে ৪ শতাংশ। ভিটামিন-সি এর বেলায় এখনো ক্ষতিকর প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়নি। এখন চিকিৎসকদের পরামর্শ হ'ল- শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে ভিটামিনযুক্ত খাবারের কোন বিকল্প নেই। তাই ভিটামিনের ওষুধ না খেয়ে ভিটামিনযুক্ত সুষম খাবার খাওয়াই উচিত।

মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

আত-তাহরীক ও 'আন্দোলন'-এর নেতা কর্মীদের প্রতি...

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

আমি একজন যেলা পর্যায়ের অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা এবং একজন জন্মগত 'আহলেহাদীছ'। রাফঊল ইয়াদায়েন করে ছালাত আদায় ব্যতীত অন্যদের থেকে নিজেদের তেমন কোন পার্থক্য আগে বুঝতাম না। কিন্তু মুহতারাম আমীরে জামা'আতের আপোষহীন লেখনী এবং ওজস্বিনী বাগ্মিতা আমাদের মৃত আত্মাকে কিছুটা হ'লেও জাগ্রত করেছে। তাঁর অতুল্য সাহিত্যিক প্রতিভা, ছহীহ দলীল ভিত্তিক তেজস্বী বাগ্মিতা, সূক্ষ্ম গবেষণাধর্মী ক্ষুরধার লেখনী, অনৈসলামী রুচির বিরুদ্ধে সর্বদা সংস্কারক সুলভ আচরণ, সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে খোলা মনে মেশার যোগ্যতা, দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি উদার জনসেবা, অর্থ-বিত্তের প্রতি লোভহীনতা, আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতা হ'তে মুক্ত সাধাসিধা জীবন-যাপন, ইসলামের সঠিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিতপ্রাণ ও নিঃস্বার্থভাবে দিনরাত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করার মত মানসিক ও দৈহিক যোগ্যতা, সবকিছু মিলে ডঃ গালিব এদেশের একজন অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব এবং আল্লাহ্র এক অসাধারণ নে'মত।

তিনি প্রমাণ করেছেন যে, 'আহলেহাদীছ প্রচলিত অর্থে কোন ফের্কা নয় বরং একটি আন্দোলন'। যার লক্ষ্য হ'ল, 'নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা'। ধর্মের নামে ও রাজনীতির নামে জনগণকে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে ও সর্বপ্রকার চরমপন্থার বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলন ছিল আপোষহীন। সেজন্য চরমপন্থীরা তাঁকে দু'বার হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল। দেশবিরোধী ও রাষ্ট্রঘাতি চক্রান্তসমূহের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদা সরকারকে ও দেশবাসীকে সতর্ক করতেন। তিনি পিওর ইসলাম ও পপুলার ইসলামের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'। জাতিকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন 'আসুন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি'।

তিনি বলেছেন, ভাইয়ে ভাইয়ে দলাদলি বা রাজনৈতিক ক্ষমতার কাড়াকাড়ির মাধ্যমে নয়, বরং আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমেই সমাজে সত্যিকারের পরিবর্তন আসবে এবং আগামীতে সংগঠিত জনমতের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের বহু কাংখিত 'ইসলামী খেলাফত'। বস্তুতঃ এটাই হ'ল সমাজ বিপ্লবের দর্শন, নবীগণ যে দর্শন প্রচার করে গেছেন। ইসলাম বিরোধী 'থিংক ট্যাংক' এটা বুঝতে পেরেই ডঃ গালিবের লেখনী ও কণ্ঠ স্তব্ধ করেছে মাত্র। আমরা জানি ডঃ গালিবের সমসাময়িক লোকেরা অনেকে দলবাজি করে এমপি ও মন্ত্রীত্বের স্বাদ নিয়েছেন। কিন্তু তাতে জনগণের বা ইসলামের কোন লাভ বা উন্নতি হয়নি। বরং ইসলামের উদার ও নির্দলীয় চরিত্র ক্ষুণ্ন হয়েছে মাত্র। বলা বাহুল্য দলনেতাদের আবেদন তাদের স্বার্থান্ধ দলীয় নেতাকর্মীদের কাছে। কিন্তু ডঃ গালিবের আবেদন দলমত নির্বিশেষে সকল আল্লাহভীরু মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায়। তাঁর প্রতি ঈমানদার জনগণের বাঁধভাঙ্গা আবেগকে ঠেকানোর জন্যই জাতীয় দলবাজ ও আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী শক্তির চক্রান্তে আজ ডঃ গালিবকে ডজন খানেক মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

কারাগার হ'ল দুনিয়ার জীবন্ত কবরস্থান। শুনেছি তাঁকে ফাঁসির আসামীদের নিঃসঙ্গ সেলে ৬×৪ হাত ছোট্ট কুঠরীতে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল বিগত প্রায় পৌনে তিন বছর যাবৎ। বৃটিশ আমল হ'লে তিনি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র প্রফেসর ও সামাজিক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে প্রথম দিন থেকেই কারাগারে ডিভিশন পেতেন বৃটিশ কারাবিধির ৯১০/১ ধারা অনুযায়ী। কিন্তু এখন আমরা স্বাধীন হয়েছি। তাই যাচ্ছে তাই ভাবে তাঁর উপরে চালানো হয়েছে মর্মান্তিক নির্যাতন তথাকথিত গণতন্ত্রী ও মানবাধিকারবাদী সরকারের হাতে। কথিত দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী-এমপিরা কারাগারে ঢুকেই সরাসরি ডিভিশন পাচ্ছেন। অথচ যাঁর উদ্যোগে ও কুয়েতী এনজিওর অর্থায়নে সারা দেশে হাযার খানেকের অধিক উন্নতমানের মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছাড়াও কয়েক শত গভীর ও অগভীর নলকূপ প্রতিষ্ঠিত হ'ল, বন্যা ও শীতে হাযার হাযার অসহায় পরিবার সাহায্য পেয়ে ধন্য হ'ল, যাঁর লিখিত ২৫টির মত বইয়ের একটিরও বিক্রয় মূল্য তিনি বা তাঁর পরিবার গ্রহণ করেন না, যাঁর প্রকাশিত কয়েক শত মূল্যবান প্রবন্ধের বিনিময়ে তিনি কোনদিন কোন প্রকার দুনিয়াবী লাভের চিন্তা করেননি, সেই নিঃস্বার্থ সমাজসেবক মানুষটিকেই করা হয়েছে সব ধরনের অসম্মান। আল্লাহ্র গযব কি ঐসব যালেমদের উপর আসবে না? মাযলূমের দীর্ঘশ্বাস কি আল্লাহ শুনেননি? ইনশাআল্লাহ ওদের শাস্তি পেতেই হবে ইহকালে হোক আর পরকালে হোক। জানি না তাঁকেও মিসরের নিরপরাধ ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের ন্যায় মিথ্যা খুনের দায়ে জেলখানাতেই হত্যা করা হবে কি-না। শুনেছি তাঁর নামে নাকি নওগাঁ ও বগুড়ায় দু'টি খুনের মামলা দেওয়া হয়েছে। সেদিন সাইয়িদ কুতুবকে শহীদ করা হয়েছিল বৃটিশের ইঙ্গিতে আজ ডঃ গালিবকে শহীদ করা হ'তে পারে হয়তবা মার্কিনের ইঙ্গিতে। কেননা মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের পলিটিক্যাল সেক্রেটারী রাজশাহী নওদাপাড়াতে গিয়ে ডঃ

Contents

গালিবের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। ধারণা করা যায় দু'ঘন্টার সেই সাক্ষাৎকারে ডঃ গালিবের কাছ থেকে তিনি যে 'হক' কথা শুনেছিলেন, তা নিশ্চয়ই তাদের মত একক পরাশক্তির পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। ফলে ঐ সাক্ষাৎকারের চার মাসের মাথায় ডঃ গালিবকে গ্রেফতার করে তৎকালীন জোট সরকার এবং এতে খুশী হয়ে ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিবৃতি দেন পত্রিকায়।

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে When you wish to kill your dog, give him a bad name. অর্থাৎ যখন তুমি তোমার কুকুরকে হত্যা করতে চাও, তখন তাকে একটা মন্দ নাম দাও'। এ ক্ষেত্রেও তাই হ'ল। জোট সরকার তাদের নিজেদের পাপ ঢাকার জন্য উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর কৌশল অবলম্বন করল। হঠাৎ ১০/১২ দিন আগে মিডিয়াগুলো একযোগে কোরাস গেয়ে উঠল ডঃ গালিবের বিরুদ্ধে মুখরোচক মিথ্যা অপবাদ দিয়ে। ১৭/০২/২০০৫ইং তারিখে ডঃ গালিব সাংবাদিক সম্মেলন করলেন এবং এসবের লিখিত জবাব দিলেন। কিন্তু তার প্রচার কভারেজ পেল না। তারপর ২২/০২/২০০৫ইং তারিখে তাবলীগী ইজতেমার মাত্র একদিন আগে তাঁকে সহ চারজন কেন্দ্রীয় নেতাকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তারপর চাপানো হ'ল ডজন খানেক মিথ্যা মামলা দেশের ৬টি যেলায়। ১৬ মাস পরে তিনজন যামিন পেলেও ডঃ গালিব আজও যামিন পাননি। পড়ে আছেন কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে বিগত ৩৮টি মাস যাবৎ। এটাই হ'ল এদেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রকৃষ্ট নমুনা।

শুধু ডঃ গালিবকে গ্রেফতার করেই ক্ষান্ত হয়নি বিগত জোট সরকার। বরং দেশের কয়েকটি যেলায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইয়াতীমখানা গুলোতে প্রায় তিন শতাধিক ইয়াতীমের অর্থ সাহায্য দিত যে কুয়েতী এনজিওটি, রামাযানের পবিত্র মাসে তাদের প্রতি কড়া নোটিশ দিয়ে সাহায্য বন্ধ করে দেয় তৎকালীন সরকারের ইসলামপন্থী সমাজ কল্যাণমন্ত্রী। ফলে ঐ ইয়াতীমগুলি আজ পথে পথে ঘুরছে। সেই সাথে বন্ধ হয়ে গেছে তাদের শুরু করা মসজিদ, মাদরাসা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি প্রকল্পসমূহ, যা আজও পড়ে আছে অসমাপ্ত অবস্থায়। যারা নিঃস্বার্থভাবে স্রেফ আল্লাহ্র ওয়াস্তে এদেশে অসহায় মানবতার সেবা করে যাচ্ছিল, সেই ভ্রাতৃপ্রতিম কুয়েতী এনজিওর বিরুদ্ধে সরকারের এত গোস্বা কেন? অথচ সূদের কারবার করে এদেশে দরিদ্র জনগণের রক্ত চুষে খাচ্ছে দেশী ও বিদেশী যে উনপঞ্চাশ হাযারের মত এনজিও, তাদের বিরুদ্ধে ঐ ইসলামপন্থী মন্ত্রীর কোন আপত্তি কখনো দেখা যায়নি।

ভাই শফীকুল ইসলামের দরদী কণ্ঠের ক্যাসেটে যখন 'কে ঐ মুওয়াযযিন' এর হৃদয় ছোঁয়া জাগরণীটি শুনি, তখন হৃদয় ফেটে বেরিয়ে আসে, হায়! সে মুওয়াযযিন তো আর কেউ নন, তিনি যে আমাদের প্রাণপ্রিয় আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তাঁর আযানের ধ্বনি আজ হিন্দু ভাই অনুক্ত মিত্রের হৃদয়কে আন্দোলিত করেছে। তিনি ডঃ গালিবের মুক্তি চেয়ে কবিতা লিখেছেন **আত-তাহরীক**-এর নভেম্বর'০৭ সংখ্যায়। আমার পক্ষ হ'তে প্রাণ উজাড় করা ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ রইল অনুক্ত মিত্রের প্রতি। আহ্বান রইল হে ভাই অনুক্ত! মৃত্যুর আগেই তুমি আল্লাহ্র মিত্র হয়ে যাও। ডঃ গালিবের দাওয়াত কবুল করে খাঁটি মুসলমান হয়ে যাও। আল্লাহ তুমি অনুক্তকে তোমার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও- আমীন!! এমনি হাযারো 'অনুক্ত' আজ চেয়ে আছে ইসলামের সঠিক দাওয়াত পাবার আশায়।

হে 'আন্দোলন' এর নেতা-কর্মী, ভাই ও বোনেরা! তোমরা কি ভেঙ্গে পড়েছ? নেতার রেখে যাওয়া আদর্শ কি ভুলে গেছ? তোমাদের দাওয়াতী জাযবায় কমতি কেন? তোমরা কি মিথ্যা অপবাদের ভয়ে কুঁকড়ে গেছ? আল্লাহ্র রাসূলকে তো এক ডজনের অধিক মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছিল। কই তিনি তো ভেঙ্গে পড়েননি। মার খেয়ে একাকী আদর্শ প্রচার করে গেছেন। তবেই তো আবুবকর, ওমরের সাক্ষাত মিলেছিল। ছাহাবীগণ রাসূলকে ছেড়ে পালাননি। কিন্তু তোমাদের অবস্থা তো পলায়নপর মনে হচ্ছে। শিরদাঁড়া উঁচু করে দাঁড়াও। বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ত্যাগে কোন আদর্শ কোনদিন বিজয় লাভ করেনি। আহলেহাদীছের নির্ভেজাল আদর্শ ইনশাআল্লাহ এদেশে বিজয় লাভ করবেই। প্রয়োজন কিছু ত্যাগী মানুষের। ডঃ গালিব তোমাদের কাছে তাঁর আন্দোলনের আমানত সমর্পণ করে গেছেন। দোহাই আল্লাহ্র! তোমরা তাঁর আমানতের খেয়ানত করো না। আন্দোলনকে আরো বেগবান করো। যদি কখনো তিনি মুক্তি পান, তাহ'লে তা দেখে তিনি যেন শান্তি পান। আর যদি কারাগার হ'তে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ্র মত তাঁর জানাযা বেরিয়ে আসে, তাহ'লে দেশবাসী যেন বলতে পারে, ডঃ গালিব মরেননি। তিনি অমর আছেন তাঁর নিবেদিত প্রাণ কর্মীদের মাঝে। তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন এদেশের ঈমানদার আহলেহাদীছ জনতার হৃদয়ের মাঝে।

পরিশেষে আত-তাহরীক এর স্নেহাস্পদ তরুণ সম্পাদককে বলব, আহলেহাদীছ-এর প্রকৃত আদর্শ তথা ইসলামের সঠিক পথ লেখনীর মাধ্যমে জাতির সামনে তুলে ধরার মহান দায়িত্ব আপনাদের স্কন্ধে সমর্পিত হয়েছে। অতএব আহলেহাদীছ আন্দোলনকে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করুন। মনে রাখবেন আত-তাহরীক হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ বুকে চেপে ধরি। চোখ বুঁজে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের কথা ভাবি। মনের আয়নায় ভেসে ওঠে কারাগারে তাঁর আকুতিভরা বিবর্ণ চেহারা। মনের অজান্তে চোখ থেকে ঝরে পড়ে দু'ফোঁঠা অশ্রু...। দুর্বল বৃদ্ধের এর চেয়ে দেবার আর কি আছে বলুন...!!

** মুহাম্মাদ নাযির হোসাইন সরদার*
বোনারপাড়া, গাইবান্ধা।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ইসলামী জালসা

বুড়িচং, কুমিল্লা ৬ মার্চ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বিকাল ৩-টায় দক্ষিণ-পূর্ব জগতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের উদ্যোগে স্থানীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় মাঠে এক বিরাট ইসলামী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী জালসায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবি ও ঢাকাস্থ বুড়িচং উপযেলা সমিতির সভাপতি এডভোকেট ইখলাছুদ্দীন ভূইয়া। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন' -এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্রগ্রামের সাবেক সহকারী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ বক্তা ছিলেন নরসিংদী যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন, কোরপাই সিনিয়র মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা শরাফত আলী প্রমুখ।

প্রধান বক্তা তাঁর বক্তৃতায় বলেন, সমঅধিকারের নামে কুরআনে ঘোষিত সম্পত্তি বন্টনের নীতিমালা পরিবর্তনকারীরা কঠিনভাবে অভিশপ্ত। তিনি বলেন, কুরআন বিরোধী কোন আইন পূর্বেও কার্যকর হয়নি, এখনো হবে না। তিনি উল্লেখ করেন, ২০০ বৎসরের বৃটিশ শাসনামলে যে আইনে বৃটিশরা পর্যন্ত হাত দিতে সাহস পায়নি, হিন্দু অধ্যুষিত প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে যে আইনকে এখনো শ্রদ্ধা করা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সকল উপদেষ্টা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাদের কী এমন দায় পড়েছে যে, কুরআন বিরোধী এমন আইন রচনা করে পুরো জাতিকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলতে হবে? তিনি অবিলম্বে কুরআন বিরোধী নীতি ও আইনসমূহ প্রত্যাহার করার জোর দাবী জানান।

যুবসংঘ

ছাত্র সমাবেশ

মজিদপুর, যশোর ২৬ মার্চ বুধবারঃ অদ্য বিকাল ৪-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কেশবপুর থানাধীন মজিদপুর শাখার উদ্যোগে স্থানীয় মজিদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর অত্র শাখা সভাপতি জনাব ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ৩নং মজিদপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের পুলিশিং কমিটির সেক্রেটারী মাষ্টার নেছার আলী, যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান, সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল মালেক, মজিদপুর শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল কুদ্দুস প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, পরীক্ষার্থীদেরকে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন।

সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং আহলেহাদীছদের আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য যোগ্য, মেধাবী ও নৈতিকতা সম্পন্ন ছাত্র সমাজের বিশেষ প্রয়োজন। এটি এখন সময়ের অনিবার্য দাবী। তাঁরা উপস্থিত ছাত্রদেরকে নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এদেশের একক যুবসংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র পতাকাতলে সমবেত হয়ে শিক্ষাঙ্গনে দাওয়াতী কার্যক্রম জোরদার করার আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকটে বিগত সরকারের ন্যক্কারজনক ষড়যন্ত্রের নির্মম শিকার মিথ্যা মামলায় দীর্ঘ তিন বছরের অধিক সময় যাবৎ কারারুদ্ধ মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান।

সাতক্ষীরা, ১৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাঁকাল ইসলামিক সেন্টার শাখার উদ্যোগে সেন্টার জামে মসজিদে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ' -এর অর্থ সম্পাদক মাওলানা মুযাফফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ছাত্র সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীর সম্মানিত শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক ও অত্র মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা সারোয়ার, মাওলানা সাঈদুর রহমান, ক্বারী আব্দুর রহীম প্রমুখ।

প্রশিক্ষণ

নাছিরাবাদ, ঢাকা ৪ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে নাছিরাবাদ উত্তর পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে

এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি হুসাইন আল-মাহমূদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব তাসলীম সরকার। তিনি 'সাংগঠনিক জীবনের গুরুত্ব এবং তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, নির্ভেজাল তাওহীদকে মানুষের সার্বিক জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন নিবেদিত প্রাণ একদল কর্মী বাহিনী। তিনি উপস্থিত সকল ছাত্রবৃন্দকে 'যুবসংঘ'-এর প্রতাকা তলে সমবেত হয়ে অহী ভিত্তিক জীবন গড়ার আহ্বান জানান।

অন্যান্যের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ও 'যুবসংঘ'-এর অনুমোদিত কর্মী মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন 'যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মেহেদী আরিফ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক রেযাউল করীম।

বংশাল, ঢাকা ১৮ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৮-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বংশালস্থ যেলা 'যুবসংঘ'-এর কার্যালয়ে এক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের সাবেক সহকারী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। তিনি 'সংগঠন ও তার লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতি' সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রধান উপদেষ্টা হাফেয আব্দুছ ছামাদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, যেলা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আহসানুর রাকীব, বাংলা কলেজ-এর আহ্বায়ক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসিন হলের আহ্বায়ক মুহাম্মাদ শাহীনুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন 'যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর অর্থ সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মেহেদী আরিফ। দরসে হাদীছ পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পদাক রেযাউল করীম।

আলোচনা সভা

মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী ১১ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজবাড়ী যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আব্দুর রঊফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আতাউর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক সাঈদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক ঈমান আলী, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা মুনীরুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ঈমান আলী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম।

দায়িত্বশীল বৈঠক

সাতক্ষীরা, ১৭ এপ্রিল, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল সাড়ে ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় কদমতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘ ঢাকা কলেজ শাখার সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবীর। উক্ত বৈঠকে যুবসংঘ যেলা দায়িত্বশীল সহ সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ, সিটি কলেজ, শহীদ স্মৃতি কলেজ, সীমান্ত ডিগ্রী কলেজ, কলারোয়া সরকারী কলেজ, ডে নাইট কলেজ, মাদরাসা আলিয়া সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ইয়াকূব হোসাইনের স্ত্রী মুসাম্মাৎ মরিয়ম বেগম তিন বছর যাবৎ শয্যাশায়ী থাকার পর গত ১৬ এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭-টায় ইন্তিকাল করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৩ বৎসর। তিনি স্বামী, ২ মেয়ে, ১ ছেলে ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। পরদিন ১৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার দুপুর ২-টা ২৫ মিনিটে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাষ্টার নূরুল হুদা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব রইসুদ্দীন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন ও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মুসলেমুদ্দীন প্রমুখ। এছাড়া স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক নূরুল ইসলাম তার জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। অতঃপর বেলা ৩-টার সময় তাকে শালিয়া গ্রামে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২৮১)ঃ নবীদের সঠিক পরিসংখ্যান জানিয়ে বাধিত করবেন। আমরা বিভিন্নভাবে শুনে থাকি যে, নবীদের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাযার মতান্তরে ২ লক্ষ ২৪ হাযার। অথচ পবিত্র কুরআনে মাত্র ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ আছে। তাহ'লে অবশিষ্ট নবীগণের পরিসংখ্যান আমরা কিভাবে জানব? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মামূনুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ নবী-রাসূলগণের সঠিক সংখ্যা হচ্ছে এক লক্ষ চব্বিশ হাযার। আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি বললাম! হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! নবীদের সংখ্যা কত? উত্তরে তিনি বললেন, ১ লক্ষ ২৪ হাযার *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৭৩৭, সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহা হা/২৬৬৮; তাহক্বীক্বে তাফসীর কুরতুবী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২০)*। উল্লেখ্য যে, উক্ত সংখ্যা ছাড়া আরো কতিপয় সংখ্যা বিভিন্ন বইয়ে লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সেগুলোর ছহীহ কোন ভিত্তি নেই *(তাহক্বীক্ব তাফসীর কুরতুবী ৬/২০-২৩)*।

পবিত্র কুরআনে ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করে নবী-রাসূলগণের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে মাত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি এমন রাসূল পাঠিয়েছি যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শুনিয়েছি ইতিপূর্বে এবং এমন কতিপয় রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শুনাইনি' *(নিসা ১৬৪)*।

প্রশ্নঃ (২/২৮২)ঃ আল্লাহ তা'আলা কি নবীর উপর দরূদ পড়েন?

- সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীরবাড়ী, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মহান আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পড়েন অর্থাৎ রহমত অবতীর্ণ করেন। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ আমাদের মত তার নবীর উপর দরূদ পড়েন। ফেরেশতামণ্ডলীও রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য আল্লাহ্র কাছে রহমত প্রার্থনা করেন। মুমিনদেরকেও সে জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *(আহযাব ৫৬; মাওলানা জুনাগড়ী, কুরআনুল কারীম, উর্দু তরজমা সহ তাফসীর, পৃঃ ১১৯০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলা হ'ল, হে রাসূল (ছাঃ)! আপনার প্রতি আমাদেরকে কিভাবে দরূদ পড়তে হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দরূদে ইবরাহীম বা যে দরূদ আমরা ছালাতে পড়ে থাকি সে দরূদের কথা উল্লেখ করলেন *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯১৯; বুখারী ৪৭৯৭)*।

প্রশ্নঃ (৩/২৮৩)ঃ হারাম খাওয়া জায়েয নয়। কিন্তু এখন সমাজের অনেক মানুষই হারাম খায়। কেউ প্রকাশ্যে খায় আবার কেউ অপ্রকাশ্যে খায়। কেউ সূদ-ঘুষ খায়, কেউ ব্যবসার সম্পদে হারাম মিশ্রিত করে হারাম খায়, কেউ মালের যাকাত দেয় না। প্রশ্ন হ'লঃ এ প্রকৃতির কেউ দাওয়াত দিলে দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা যাবে কি?

- সেলিম রেযা
দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ হারাম ভক্ষণকারী সম্পর্কে যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তার উপার্জিত খাদ্য হারাম, তাহ'লে তার দাওয়াত বর্জন করা উচিত। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র রূযী ভক্ষণ কর' *(বাক্বারাহ ১৭২)*। তাছাড়া হারাম খাদ্য খেলে ইবাদত কবুল হয় না *(ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬৯)*।

প্রশ্নঃ (৪/২৮৪)ঃ খাদ্য খাওয়ার সময় বা অন্য কোন সময়ে আমাদের অনেকের মুখে বা জিহ্বায় কামড় লেগে যায়। তখন কেউ বলে আপনাকে কেউ স্মরণ করেছে, কেউ বলে আজ কিছু একটা ঘটবে ইত্যাদি। এমন মন্তব্য করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন
ষাড়বুরুজ মধ্যপাড়া
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ এটা সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার বা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্নঃ (৫/২৮৫)ঃ ক্বিরাআতে মাদ, মাখরাজের ভুল হ'লে কিংবা কোন রাক'আতে দুই সিজদার স্থলে এক সিজদা করা হয়েছে বলে সন্দেহ হ'লে করণীয় কি?

- সেলিম রেযা
দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ সিজদা ছালাতের রুকন। সেকারণ একটি সিজদা ছুটে যাওয়ার সন্দেহ হ'লে উক্ত রাক'আতটি রাক'আত বলে গণ্য হবে না; বরং পুনরায় উক্ত রাক'আত আদায় করতে হবে এবং সহো সিজদা দিতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৪)*। অপরদিকে ক্বিরাআতে ভুল হ'লে সহো সিজদার প্রয়োজন নেই। কারণ ক্বিরাআতে ভুল হ'লে বা কিছু অংশ ছুটে গেলে সহো সিজদা করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ছহীহ ক্বিরাআত পাঠকারী ব্যক্তিকেই ইমামতি করা উচিত *(ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৮ 'ইমামতি' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৬/২৮৬)ঃ জনৈক ব্যক্তি বলেন 'দাঁড়িয়ে মিসওয়াক করলে যৌনশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং বসে করলে হ্রাস পায়'। উক্ত কথার সত্যতা জানতে চাই।

- ঠিকনা বিহীন।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্যের শারঈ কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৭/২৮৭)ঃ আসওয়াদ আমেরী (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ফজরের ছালাত আদায় করেছিলাম। তিনি সালাম ফিরানোর পর আমাদের দিকে ফিরে বসলেন এবং দুই হাত তুললেন ও দো'আ করলেন'। উক্ত হাদীছের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আশরাফুল আলম শিমুল
বাশদহা বাজার, বাশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বর্ণনাটি জাল *(তাহযীবুত তাহযীব, ১১/৩৫১, পৃঃ রাবী-৮১৬৬)*। উক্ত হাদীছের শেষের অংশ 'এবং হাত তুললেন ও দো'আ করলেন' (ورفع يديـة ودعا) হাদীছের কিতাবে নেই। এটা মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বার বরাত দিয়ে ফাতাওয়া নাযীরিয়াতে উল্লেখ করা হ'লেও মূল কিতাবে শেষের ঐ অংশটুকু নেই *(দেখুনঃ হাফেয আব্দুল্লাহ ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ (বৈরুত ছাপাঃ দারুল ফিকর, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৯ হিঃ/১৯৮৯ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭)*।

প্রশ্নঃ (৮/২৮৮)ঃ ওযূ আরম্ভ করার পর মাঝা-মাঝিতে কিংবা শেষের দিকে কোন কারণবশত ওযূ নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় নতুনভাবে ওযূ করতে হবে কি?

- এডভোকেট আখতার
মুহুরীপাড়া, কক্সবাজার।

উত্তরঃ 'বিসমিল্লাহ' বলে ওযূ আরম্ভ করার পর মধ্যখানে কিংবা শেষের দিকে ওযূ নষ্ট হয়ে গেলেও পুনরায় নতুনভাবে ওযূ করতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০০; ফাতাওয়া লাজনাতুত দায়েমাহ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৬)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৮৯)ঃ কুরআন না বুঝে পড়লে নেকী পাওয়া যাবে কি? এভাবে কুরআনের হক আদায় হবে কি?

- সোহেল
তারাবনিয়ার ছড়া, কক্সবাজার।

উত্তরঃ কুরআন বুঝে তেলাওয়াত করা অধিক উত্তম। তবে অর্থ বুঝে তেলাওয়াত না করলেও পূর্ণ নেকী পাওয়া যাবে। অনেক ছাহাবীও কুরআনের মর্ম পরিপূর্ণ অনুধাবন করতে পারতেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ তেলাওয়াত করবে তার জন্য একটি নেকী রয়েছে। আর এ একটি নেকী হবে দশটি নেকীর সমান। আমি বলছি না যে, 'আলিম লাম মিম' একটি হরফ। বরং 'আলিফ' একটি হরফ, 'লাম' একটি হরফ ও 'মীম' একটি হরফ *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২১৩৭)*। আলোচ্য হাদীছে কুরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য কোন শর্তারোপ করা হয়নি। তাছাড়া উক্ত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) এমন একটি আয়াত উদাহরণ হিসাবে পেশ করেছেন, যার অর্থ কোন মানুষ জানে না। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তার জন্য নেকী দিবেন এবং হকও আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (১০/২৯০)ঃ সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে আগে হাত রাখা এবং হাঁটু রাখা উভয় বর্ণনা পাওয়া যায়। কোন বর্ণনাটি সঠিক?

- মুহাম্মাদ নাজমুল হাসান
বাশদহা বাজার, বাশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদায় যাওয়ার সময় আগে মাটিতে হাত রাখতেন অতঃপর দুই হাঁটু রাখতেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৮৪০-৪১; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৬২৭; দারাকুৎনী, হাকেম, মিশকাত হা/৮৯৯; ফাৎহুল বারী ২/২৯১ পৃঃ)*। আগে হাঁটু রাখা যাবে না। উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ আবুদাঊদ হা/৮৩৮-৩৯; মিশকাত হা/৮৯৮; আলবানী হাশিয়া মিশকাত ১/২৮২ পৃঃ, ইরওয়াউল গালীল হা/৩৫৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯২৯)*।

প্রশ্নঃ (১১/২৯১)ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে 'আদন' নামক একটি প্রাসাদ রয়েছে, যার চারপাশে মিনার রয়েছে। এর পাঁচ হাযার দরজা আছে এবং প্রত্যেক দরজার উপর পাঁচ হাযার চাদর রয়েছে। তাতে শুধু নবী, ছিদ্দীক্ব, শহীদ এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহগণ অবস্থান করবেন। উল্লিখিত হাদীছটির সনদ সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শাহ মুহাম্মাদ আবু শাহীন
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছের সনদ যঈফ। ইমাম যাহাবী বলেন, এর সনদে আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বিন হুরমুয রয়েছে। সে দুর্বল রাবী। ইবনুল মাদিনী, আবু হাতিম, ইমাম নাসাঈও তাকে দুর্বল বলেছেন *(তাহক্বীক্বে তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা ছোয়াদ এর ৫০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (১২/২৯২)ঃ আমার আকাঙ্ক্ষা হয় যে শিশু অবস্থায় যদি মৃত্যু হ'ত তাহ'লে কতইনা ভাল হ'ত। কারণ সে সময় কোন পাপ কাজ করতাম না। ফলে কবরে, হাশরে ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতাম। এ ধরণের আকাঙ্ক্ষা করা যাবে কি?

- সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীরবাড়ী, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কোন অবস্থাতেই মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করা যাবে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৯৮-১৬০০)*। কেননা এতে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। বরং বেঁচে থেকে দীর্ঘ হায়াত লাভ ও হক পথে দৃঢ়ভাবে থাকার জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে হবে এবং প্রার্থনা করতে হবে। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, 'যার বয়স বেশী ও আমল ভাল রয়েছে' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫২২৪)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দুই বন্ধুর একজন শহীদ হয়।

অপরজন পরে মারা যায়। তখন ছাহাবীগণ তার জন্য দো'আ করেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী বললে? ছাহাবীগণ বললেন, আমরা আল্লাহ্র নিকট দো'আ করলাম যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুক, তার উপর দয়া করুক এবং তার বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দিন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে তার পরের ছালাত ও আমলগুলি কী হবে? এদের দু'জনের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে আসমান-যমীনের ন্যায়' *(আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫২৮৬)*। অতএব মৃত্যু কামনা নয় বরং বেঁচে থেকে নেক আমলের মধ্যেই সর্বাধিক কল্যাণ নিহিত আছে।

প্রশ্নঃ (১৩/২৯৩)ঃ বগলের লোম কাটা যাবে কি?

- দীপু
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ফিতরাত হচ্ছে (১) গোঁফ ছোট করা (২) দাড়ি ছেড়ে দেওয়া (৩) মিসওয়াক করা (৪) নাকে পানি দেওয়া (৫) নখ কাটা (৬) আঙ্গুলের গিরা সমূহ ধৌত করা (৭) বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা (৮) নাভীর নীচের লোম চেঁছে ফেলা (৯) ইস্তিঞ্জা করা। রাবি বলেন, আমি দশমটি ভুলে গেছি। তবে তা কুলি করা হ'তে পারে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৯)*। উল্লেখ্য, কেউ যদি একান্তই উপড়াতে অক্ষম হয় তাহ'লে যেকোন উপায়ে তা পরিষ্কার করতে পারে *(ফাতওয়া লাজনা দায়েমা ৫/১৭১)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৯৪)ঃ জনৈক বক্তার মুখে শুনেছি যে, সঊদী লেহানে কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে, অন্যথা ভুল হবে। এ কথা কি ঠিক?

- ওবায়দুল্লাহ
বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ উক্ত কথা ঠিক নয়। বরং কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে তাজবীদ সহকারে এবং তারতীলের সাথে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কুরআন তেলাওয়াত করুন তারতীল সহকারে' *(মুযযাম্মিল ৪)*। 'তারতীল' অর্থ সহজ ও শুদ্ধভাবে ধীর স্থিরতার সাথে উচ্চারণ করা।

প্রশ্নঃ (১৫/২৯৫)ঃ ছালাতের মধ্যে যে দো'আ করার কথা বলা হয়েছে সেগুলি কোন্ দো'আ? মুছল্লী কি ইচ্ছামত দো'আ করতে পারে?

- মাহমূদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ পুরো ছালাতটাই মুনাজাত বা দো'আ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা ধৈর্যসহকারে ছালাতের মাধ্যমে প্রার্থনা কর' *(বাক্বারাহ ৪৫)*। ছালাত হ'ল দো'আ করার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করার সর্বোত্তম স্থান হ'ল সিজদা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বান্দা তখনই সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্র নিকটবর্তী হয় যখন সে সিজদায় থাকে। সুতরাং তোমরা সেখানে বেশী বেশী দো'আ কর' *(ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪)*। অন্য হাদীছে তিনি বলেন, 'সিজদায় সাধ্যমত দো'আ করার চেষ্টা করো। আশা করা যায় তোমাদের দো'আ কবুল করা হবে' *(ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩)*। উল্লেখ্য, রুকূ এবং সিজদায় কুরআনের আয়াত ছাড়া হাদীছে বর্ণিত অন্যান্য দো'আ সমূহ পাঠ করতে হবে *(ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩)*। এছাড়া শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ ও দরূদ পড়ার পর সালামের পূর্বে ইচ্ছামত দো'আ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তাশাহহুদে বসে মুছল্লী যেন তার যা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী দো'আ করে' *(ছহীহ বুখারী হা/৮৩৫)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২৯৬)ঃ ছালাতের ইক্বামত হচ্ছে এমতাবস্থায় কেউ মসজিদের বাইরে থেকে ইক্বামত শুনতে পেলে সে কি দৌড়ে এসে জামা'আতে শামিল হবে? নাকি স্বাভাবিক গতিতে আসবে?

- আলমগীর
মাষ্টারপাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় তাড়াহুড়া করে জামা'আতে শামিল হওয়া যাবে না। বরং স্বাভাবিক গতিতে গিয়ে জামা'আতে শরীক হ'তে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হবে তখন তোমরা তাড়াহুড়া করে ছালাতে এসো না। বরং তোমরা হেঁটে শান্তভাবে আসো। অতঃপর ছালাতের যে অংশটুকু পাও তা আদায় করো এবং যে অংশটুকু ছুটে যায় তা পূর্ণ কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৬)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২৯৭)ঃ তাকবীর দিয়ে হাত বাঁধার পর কেউ সামনে দিয়ে গেলে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-নাম ও ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে যাওয়া নিষেধ। এজন্য ক্বিবলার দিকে লাঠি, দেওয়াল কিংবা যেকোন বস্তু দ্বারা সুতরা বা আড়াল করতে হয়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন কোন কিছুকে সুতরা বানিয়ে নিয়ে ছালাত আদায় করবে তখন তার সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে লাগলে সে যেন তাকে প্রতিহত করে। যদি অস্বীকার করে তাহ'লে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। নিশ্চয়ই সে শয়তান' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭৭)*।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি ছালাতের সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি জানত যে, এতে কী পরিমাণ পাপ রয়েছে, তাহ'লে সে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকাকে উত্তম মনে করত। আবূ নাযর বলেন, 'আমি জানিনা তা ৪০ দিন, মাস না বছর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭৬)*। ছফিউর রহমান মুবারকপুরী বলেন, 'ছালাতের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে ছালাত বাতিল হবে না তবে তার ছওয়াব এবং বরকত কম হবে' *(ইতিহাফুল কিরাম শারহে বুলূগুল মারাম, পৃঃ ৬৯)*।

প্রশ্নঃ (১৮/২৯৮)ঃ ছিয়াম অবস্থায় কারো কোন অঙ্গ কেটে গেলে এবং রক্ত বের হ'লে তার ছিয়ামের ক্ষতি হবে কি?

-ফাতেমাতুয যোহরা
ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় শরীরের কোন অঙ্গ কেটে গেলে অথবা রক্ত বের হ'লে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। কারণ ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহের মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত নয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত পৃঃ ২০০২)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২৯৯)ঃ জনৈক বক্তা বলেছেন যে, ওহোদের যুদ্ধে কাফের কর্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কপাল দিয়ে রক্ত বের হ'লে সে রক্ত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর পিতা মালেক ইবনু সিনান চুষে নিয়ে গিলে ফেলেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যার রক্ত আমার রক্তের সাথে মিশে গেছে তার জন্য জাহান্নাম হারাম। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- ফারযানা
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। ঘটনাটি ইবনে জারীর ত্রুটিপূর্ণ সূত্রে বর্ণনা করেছেন *(আল বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ৪/২৫ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩০০)ঃ কোন ব্যক্তি ছিয়াম অবস্থায় লুডু খেললে তার ছিয়াম হবে কি?

-তামান্না
ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ লুডু খেলা জায়েয নয়। কারণ তা মানুষকে আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে বিরত রাখে। এদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে *(লুকমান ৬-৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি লুডু, দাবা, জুয়া বা এ জাতীয় খেলায় অংশগ্রহণ করল সে নিজের হস্ত শূকরের রক্তে রঞ্জিত করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫০০)*। তবে এজন্য ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। বরং তার নেকী কমে যাবে এবং ছিয়াম দুর্বল হবে' *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৪৮৫, ফৎওয়া নং ৪৩৪)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩০১)ঃ ওশর, যাকাত ও কুরবানীর চামড়ার টাকা মসজিদ ও মাদরাসায় দেওয়া যাবে কি? সূরা তওবার ৬০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় 'মা'আরিফুল কুরআনে' বলা হয়েছে, ছাদাক্বা, ফিৎরা ও কুরবানীর চামড়ার টাকা দ্বারা মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন দেওয়া বা ঘর তৈরী করা বৈধ নয়। একথা কি ঠিক?

- আব্দুল্লাহ
বাযাউল, টাঙ্গাঈল।

উত্তরঃ ওশর, যাকাত ও কুরবানীর চামড়ার টাকা মসজিদে দেওয়া যাবে না। কারণ সূরা তওবাহর ৬০ আয়াতে যাকাতের যে ৮টি খাত উল্লেখ করা হয়েছে মসজিদ তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে মাদরাসা 'ফী সাবীলিল্লাহ'র অন্তর্ভুক্ত হিসাবে যাকাত-ওশরের টাকা মাদরাসায় প্রদান করা যাবে *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৪৪২, ফৎওয়া নং ৩৮৬)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩০২)ঃ বর্তমানে অনেক দোকান ও অফিস আদালতে মহিলা কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়। শারঈ দৃষ্টিতে দোকানে মহিলা কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া কি বৈধ?

-শহীদুল ইসলাম
মাদরাসা দারুল সালাম নয়াবাড়ী
ভায়ালক্ষীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ষ্টল, মক্তব, হাসপাতাল, অফিস আদালত এবং অন্যান্য স্থান সহ সর্বক্ষেত্রে পর পুরুষের সঙ্গে নারীদের সংমিশ্রণ হারাম। আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে শক্তিধর এবং নারীদেরকে তাদের জন্য আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য মাহরাম ব্যতীত নারীরা যখন অন্য পুরুষের সঙ্গে একত্রিত হয় বা কোন স্থানে মিলিত হয়, তখন শয়তানের প্ররোচনায় তারা অন্যায় ও গর্হিত কাজের প্রতি ধাবিত হয় *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১০৯, সনদ ছহীহ)*। ফলে তারা এক সময় অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই অফিস-আদালতে নারী-পুরুষের একত্রিত হওয়া বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে রাসূল! আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে' *(নূর ৩০-৩১)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'চোখের যেনা তাকানো, কানের যেনা শ্রবণ করা, জিহ্বার যেনা কথা বলা, হাতের যেনা স্পর্শ করা এবং পায়ের যেনা ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে চলা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৬)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, জাহেলী যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না' *(আহযাব ৩; ফাতাওয়া লাজনাতুত দায়েমাহ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮১-৮৩)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৩০৩)ঃ রামাযান মাসে কিংবা অন্য কোন মাসে মহিলারা আতর ব্যবহার করে ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ সুগন্ধি ব্যবহার করে মহিলারা বাইরে যেতে পারবে না। চাই তা মসজিদে হৌক বা অন্য কোথাও হৌক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুগন্ধি ব্যবহার করে মহিলাদের বাইরে বের হওয়াকে যেনার সাথে তুলনা করেছেন *(আবুদাউদ হা/৪১৭৩, সনদ হাসান)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, পুরুষের খুশবু হ'ল যার রং গোপন থাকবে আর সুগন্ধি প্রকাশ পাবে। আর মহিলাদের খুশবু হলো যার রং প্রকাশ পাবে এবং সুগন্ধি গোপন থাকবে *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৪৩, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩০৪)ঃ একই বংশের ছেলে তার চাচাতো ভাতিজিকে বিয়ে করতে পারবে কি?

-ইমরান সরকার ও
রুহুল আমীন, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ একই বংশের ছেলে তার চাচাতো ভাতিজিকে বিয়ে করতে পারে। এতে কোন শারঈ বাধা নেই *(নিসা ২৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

নিজেই তাঁর আপন চাচাতো ভাই আলী (রাঃ)-এর সাথে স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-এর বিবাহ দিয়েছিলেন।

প্রশ্নঃ (২৫/৩০৫)ঃ কোন ব্যক্তির অসুস্থতার কারণে অথবা কোন নতুন জিনিস উদ্বোধন করার সময় সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি?

-শামসুযযামান
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ অসুস্থতার কারণে বা কোন নতুন জিনিস উদ্বোধনের সময় সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করার শারঈ কোন ভিত্তি নেই। তবে কারো অসুস্থতার কথা শুনে কেউ একাকী হাত তুলে দো'আ করতে পারে। তাকে দেখতে গিয়েও নিম্নের দো'আটি পড়তে পারে। যেমন-

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاس وَاشْفِ اَنْتَ الْشَّافِىْ لاَشِفَاءَ اِلاَّ شِفَائُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُسَقَمًا.

উচ্চারণঃ আযহিবিল বা'সা রব্বা-ন্নাসে ওয়াশাফি আংতাশ শা-ফী লা শিফাআ ইল্লা শিফা-উকা শিফাআল-লা-ইয়ূগা-দিরু ছাক্বামা।

অর্থঃ 'হে মানুষের প্রতিপালক! আপনি এ রোগ দূর করুন এবং আরোগ্য দান করুন, আপনি আরোগ্য দানকারী। আপনার আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য, যা বাকী রাখে না কোন রোগ' *(ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/২৪২৭)*। এছাড়াও রোগমুক্তির জন্য হাদীছে বিশেষ দো'আ বর্ণিত আছে। যেগুলি পাঠ করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, নতুন দোকান-পাট বা নতুন বাড়ীর বরকত ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে কোন পরহেযগার ব্যক্তির দ্বারা দু'রাক'আত ছালাত আদায় করিয়ে নেওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মু সুলায়মের বাড়ীতে গিয়ে বরকত ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেছিলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮)*। এতদ্ব্যতীত শয়তানের খারাবী থেকে হেফাযতের জন্য বাড়ীতে মাঝে মাঝে সূরা বাক্বারাহ বা এর শেষ দু'আয়াত তেলাওয়াত করা যাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৯)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৩০৬)ঃ বিবাহের পর স্বামীর সাথে মেলামেশার পূর্বে ক্বাযী অফিসে গিয়ে স্ত্রী স্বামীকে 'খোলা' তালাক প্রদান করে। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলা অন্যত্র বিবাহের শারঈ বিধান কি?

-হাফেয লুৎফর রহমান
বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত মহিলা এক ঋতু অপেক্ষা করার পর অন্যত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ছাবেত ইবনু কায়েস-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! ছাবেত ইবনু কায়েসের চরিত্র এবং দ্বীনের ব্যাপারে দোষারোপ করছি না। কিন্তু আমি ইসলামের মধ্যে তার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অপসন্দ মনে করছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাকে মোহরানা স্বরূপ যে বাগান দেওয়া হয়েছিল তা কি তুমি ফেরত দিতে রাযি আছে? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) ছাবেত ইবনু কায়েসকে বললেন, তুমি বাগানটা গ্রহণ করে নাও এবং তার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দাও *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২৭৪)*। আবুদাঊদ ও তিরমিযীর অপর বর্ণনায় আছে, জামীলাহ যখন তার স্বামী থেকে 'খোলা' করে নিল তখন রাসূল (ছাঃ) তার ইদ্দত এক হায়েয নির্ধারণ করলেন *(বুলূগুল মারাম হা/১০৬৬ 'খোলা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৩০৭)ঃ আমার পিতা মৃত্যুর পূর্বে আমাকে অছিয়ত করে গেছেন যে, প্রতি বছর মীলাদ মাহফিল করে শিল্পীদের দিয়ে মারেফতি গান গাওয়াবে এবং খিচুড়ি রান্না করে গরীব মিসকীনদের খাওয়াবে। আমি তা করি না, বরং অন্যদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করি। কিছুদিন ধরে আমার পিতা আমাকে স্বপ্নযোগে অছিয়তকৃত কাজ করার জন্য বলছেন। দয়া করে এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-না ও ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যার প্রতি আমার নির্দেশ নাই তা প্রত্যাখ্যাত' *(ছহীহ মুসলিম, হা/৪৪৬৮)*। আর এ ধরনের কাজের জন্য পিতা অছিয়ত করলেও বা স্বপ্নে নির্দেশ প্রাপ্ত হ'লেও তা আমল করা যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই' *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬, সনদ ছহীহ)*। উল্লেখ্য, স্বপ্ন অনেক সময় মনের ধাঁধা বা ধারণার উপর ভিত্তি করে দেখা যায়। স্বপ্নে দেখা কোন কথা বা কাজ শরী'আতে বিধান হ'তে পারে না। অতএব উক্ত বিদ'আতী অছিয়ত থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৮/৩০৮)ঃ অনেকে বলেন যে, সেন্ট ব্যবহার করা জায়েয নয়। তাতে নাকি নাপাক বস্তু মিশানো থাকে। কিন্তু সেন্টের বোতলের গায়ে হালাল লেখা থাকে। উক্ত সেন্ট ব্যবহার করা যাবে কি?

- গোলাম মুর্তুযা
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সেন্টে অপবিত্র কোন কিছু মিশ্রিত নেই তাহ'লে তা আতরের ন্যায় ব্যবহার করা যাবে। সালমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে গোসল করবে, সাধ্যানুযায়ী পবিত্রতা অর্জন করবে এবং তেল অথবা সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদের দিকে বের হবে। অতঃপর মসজিদে গিয়ে দু'জনের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করবে না। সাধ্যানুযায়ী ছালাত আদায় করতে থাকবে। ইমাম ছাহেবের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে তাহ'লে তাকে এক জুম'আ থেকে অপর জুম'আ পর্যন্ত তার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৩৮১)*। আলোচ্য হাদীছে

আমভাবে খুশবু ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট আতর বা সেন্টের নাম উল্লেখ করা হয়নি। অতএব হারাম মিশ্রিত নেই এমন যেকোন সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে।

প্রশ্নঃ (২৯/৩০৯)ঃ আমি হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলমান হওয়ার পর আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে তার বাবার বাড়ীতে চলে যায়। কিছুদিন পর সেও আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আমার নিকটে ফিরে আসে। অতঃপর আমরা পূর্বের ন্যায় স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করছি। নতুন করে আমাদের আর বিবাহ সম্পন্ন হয়নি। প্রশ্ন হ'ল- মুসলমান হওয়ার পর এভাবে আমাদের ঘর-সংসার করা সঠিক হচ্ছে কি? আমি ও আমার স্ত্রী আমার হিন্দু শশুর বাড়ীতে যাতায়াত ও খাওয়া-দাওয়া করতে পারব কি?

-আহসান হাবীব
নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ অমুসলিম স্বামী-স্ত্রী যদি একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহ'লে তারা স্বামী-স্ত্রী হিসাবে থেকে যাবে। অনুরূপভাবে স্বামী-স্ত্রীর একজন ইসলাম গ্রহণের পর অপরজন যদি ইদ্দতের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করে তাহ'লেও তারা স্বামী-স্ত্রী হিসাবেই থেকে যাবে, এতে নতুন বিবাহের প্রয়োজন হবে না *(ফাতাওয়া লাজনাতুত দায়েমাহ, ১৮ খণ্ড, পৃঃ ২৯২)*।

বদর যুদ্ধের সময় আবুল আস বন্দী হ'লে রাসূল (ছাঃ) স্বীয় কন্যা যয়নাবকে মদীনায় পাঠানোর বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দেন। তখন আবুল আস তার স্ত্রী যয়নাবকে মক্কা থেকে মদীনায় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করেন। অতঃপর কিছুদিন পর আবুল আস ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) পূর্বের বিয়ের মাধ্যমেই যয়নাবকে আবুল আসের নিকটে ফিরিয়ে দেন। নতুনভাবে বিবাহ সম্পাদন করেননি *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/২২৪০)*। সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত অবস্থায় স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করে থাকলে পূর্ব বিবাহই বহাল থাকবে। অন্যথায় নতুন করে বিবাহ সম্পন্ন করতে হবে। হিন্দু শ্বশুর-শাশুড়ীর বাড়ীতে তাদের যবেহকৃত ও হারাম খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য খাবার খাওয়া যাবে *(বুখারী হা/২৬১৯, ২০ 'মুশরিকদের হাদিয়া কবুল' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩১০)ঃ ওযূ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা ও পড়া যাবে কি?

- হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মামুন
জেদ্দা, সঊদী আরব।

উত্তরঃ অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শবিহীন তেলাওয়াত করা ও উহা দো'আ হিসাবে পড়া যায়। অনুরূপ বিনা ওযূতে কুরআন-হাদীছ স্পর্শ করে পড়া যায়। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করতেন' *(মুসলিম, সুবুলুস সালাম, ১ম খণ্ড, ১২১ পৃঃ, হা/৭২, ১২)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় আল্লামা ছান'আনী বলেন, فيدخل تلاوة القرآن ولو كان جنبا। 'সর্বাবস্থায় যিকির করার মধ্যে অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াতও অন্তর্ভুক্ত'। তিনি আরও বলেন, আল্লাহর বাণী لَايَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ অর্থাৎ 'পবিত্রগণ ব্যতীত কেউ উহা স্পর্শ করে না' *(ওয়াক্বি'আহ ৭৯)* দ্বারা বিনা ওযূ উদ্দেশ্য নয়। বরং বিনা ওযূতে কুরআন পড়া জায়েয *(ঐ দ্রঃ)*। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, অপবিত্র অবস্থায় দো'আ হিসাবে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে, যিকির-আযকার হিসাবে, কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয। যেমন সফরের দো'আয় কুরআনের আয়াত পাঠ করা *(আল-ফিক্বহুল ইসলামী ১/৩৮৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১১)ঃ মাযহাব কি? ইহা মানা কি ফরয? মাযহাব না মানলে কি মুসলমানরা কাফের হয়ে যাবে?

-ফারূক বিন আলী আহমাদ
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ 'মাযহাব' আরবী শব্দ। এর অর্থ চলার পথ। শরী'আতে 'মাযহাব' একটিই। সেটা হ'ল আল্লাহ ও রাসূলের পথ, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ *(আন'আম ১৫৩; আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৬৬ ও ১৬৫, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)* যে পথের উপরে ছাহাবী তাবেঈ এবং চার ইমাম সহ অন্যান্য ইমামরাও ছিলেন। এছাড়া দ্বিতীয় কোন মাযহাব নেই। ইসলামের নামে যে সমস্ত মাযহাব সমাজে প্রচলিত আছে তার সবই স্বর্ণযুগের বহু পরে সৃষ্ট। যেমন শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা'র মধ্যে লিখেছেন, '৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলিম নির্দিষ্টভাবে কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না'। এটা শরী'আতে বর্ধিত এবং নব আবিস্কৃত বিষয়, যা মান্য করা কোন মুসলিমের উপর ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব কিছুই নয়। বরং মাযহাব মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে এবং স্বাধীন চিন্তাধারাকে ব্যহত করেছে *(ঐ, ১/১৫২-৫৩ '৪র্থ শতাব্দী ও তার পরের লোকেদের অবস্থা বর্ণনা অনুচ্ছেদ)*। মাযহাব না মানলে কেউ কাফের হবে না। বরং মুসলিম মাত্রই স্বাধীনভাবে পবিত্র কুরআন ছহীহ হাদীছের উপর আমল করবে। যেমন ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বের কোন মানুষ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না।

প্রশ্নঃ (৩২/৩১২)ঃ প্রতিদিন অতিরিক্ত খাবার অপচয় হয় যদিও তা কাম্য নয়। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা ফেলে দিতে হয়। কাউকে দেওয়াও সম্ভব হয় না। অথচ অনেকেই না খেয়ে দিনাতিপাত করে। এতে কোন পাপ হবে কি?

- মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবীর
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

উত্তরঃ কোন অবস্থাতেই খাদ্য নষ্ট করা যাবে না। বরং খাদ্য যাতে অপচয় না হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে *(বণী ইসরাঈল ২৬-২৭)*। জাবের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের নিকট তোমাদের খাওয়ার সময় উপস্থিত হয়। তাই তোমাদের কারো লোকমা পড়ে গেলে সে যেন তা পরিষ্কার করে খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য রেখে না দেয়। আর খাওয়া

Contents

শেষে যেন আঙুল চেটে খায়। কারণ, সে জানেনা যে, কোন খাদ্যে বরকত আছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৭)*। তবে খাদ্যবস্তু নষ্ট বা খাবারের অনুপযোগী হয়ে গেলে তা ফেলে দেওয়া যাবে।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩১৩)ঃ জনৈক বক্তা বলেন যে, এক ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-এর পেশাব পান করেছিলেন। একথা কি?

-সিরাজুল ইসলাম
মানিকহার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পেশাব-পায়খানা অপবিত্র বস্তু। এই জঘন্য জিনিস কিভাবে খাওয়া জায়েয হ'তে পারে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে এ ধরনের মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকা একান্ত যরূরী।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩১৪)ঃ স্বামী যদি একটানা ৪ বছর বিদেশে থাকে তাহ'লে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে কি?

-আশরাফুন্নাহার, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক না দেয় এবং স্ত্রীও যদি খোলা না করে তাহ'লে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না। এমনকি ৪ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হ'লেও তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না' *(হাইয়াতু কিবারিল ওলামা; আত-ত্বালাকুস সুন্নাহ ওয়াল বিদ'ঈ, পৃঃ ৬২)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩১৫)ঃ একজন ব্যক্তিকে দিনে কতবার সালাম দেওয়া যাবে? অনেকে হাত উঠিয়ে সালাম দেয় এবং উত্তর দেয়। এটা কি সঠিক?

-আরিফ
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ একজন মুসলিম ব্যক্তি অপর মুসলিম ব্যক্তির সাথে যতবার সাক্ষাৎ করবে ততবার সালাম দিবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন সে যেন তাকে সালাম প্রদান করে। যদি তাদের উভয়ের মাঝে গাছ, দেওয়াল ও পাথর আড়াল হয় অতঃপর আবার উভয়ের সাক্ষাৎ হয় তাহ'লে আবার তারা যেন সালাম বিনিময় করে *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৬৫০)*। হাত উঠিয়ে সালাম দেওয়া এবং উত্তর নেওয়া জায়েয নয় *(ছহীহ তিরমিযী হা/২৬৯৫; সনদ হাসান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৯৪)*। তবে দূর থেকে সালাম দিলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩১৬)ঃ কুয়েতী এক ব্যক্তির আর্থিক সহযোগিতায় ১৩/১৪ বছর পূর্বে আমাদের এলাকায় একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ফারেগ তখন থেকেই উক্ত মসজিদের ইমাম। কিছু লোকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মসজিদটি অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু সম্প্রতি ইমাম ছাহেব মাঝে মধ্যেই বলেন, এই মসজিদটির সর্বময় অধিকর্তা তিনি নিজেই। তিনি এর হিসাব নিকাশ কাউকে দেখান না। তিনি বলেন, তার সৌজন্যেই মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। প্রশ্ন হ'ল, ইমাম ছাহেবের এরূপ দাবী কি শরী'আত সম্মত? উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় বৈধ হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ ইমাম ছাহেবের সার্বিক সহযোগিতায় মসজিদটি নির্মিত হয়েছে বলেই, নিজেকে মসজিদের সর্বময় অধিকর্তা দাবী করা, মসজিদকে তার পরিবারের অঙ্গ হিসাবে গন্য করা, কমিটির নিকট হিসাব নিকাশ পেশ না করা এবং কমিটির সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করা তার জন্য মোটেই সমীচীন নয়। বরং এ ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা-ইস্তেগফার করা বাঞ্ছনীয়। উক্ত মসজিদটি যদি ওয়াকফকৃত জায়গায় নির্মিত হয় তাহ'লে উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করাতে শারঈ কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩১৭)ঃ মুছল্লীদের জায়গা সংকুলান না হ'লে এবং মসজিদ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা না থাকলে উক্ত মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে কি? উক্ত মসজিদের স্থান বা তার আসবাবপত্র নতুন মসজিদে ব্যবহার করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ নাজিমুদ্দীন
শেখপাড়া, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদে মুছল্লীদের জায়গা সংকুলান না হ'লে এবং পার্শ্বে মসজিদ সম্প্রসারণের সুযোগ না থাকলে সে অবস্থায় উক্ত মসজিদ স্থানান্তর করা এবং মসজিদের আসবাবপত্র বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ নতুন মসজিদে ব্যয় করা শরী'আত সম্মত। মসজিদের মুতাওয়াল্লী বা কমিটি উক্ত মসজিদের স্থান বিক্রয় করে তার অর্থ দিয়ে অন্য স্থানে জমি ক্রয় করে অথবা কেউ দান করলে সেখানে নতুন মসজিদ নির্মাণ করতে পারেন। ওমর (রাঃ)-এর যুগে কূফার শাসক ছিলেন ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)। একদা মসজিদ হ'তে বায়তুল মালের অর্থ চুরি হ'লে সে ঘটনা ওমর (রাঃ)-কে জানানো হয়। তখন তিনি মসজিদ স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন এবং মসজিদ স্থানান্তর করা হয়। পরে পরিত্যক্ত মসজিদের স্থানটি খেজুর বিক্রেতাদের স্থানে পরিণত হয়' *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উ ফাতাওয়া ৩১/২১৬-২১৭ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য 'ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি বিক্রি করাও যাবে না এবং কাউকে হেবা করাও যাবে না' মর্মের হাদীছটির প্রেক্ষিতে কতিপয় আলেম বলে থাকেন যে, যেহেতু মসজিদের সম্পত্তি ওয়াক্‌ফকৃত, তাই তাকে পরিবর্তন করা যাবে না'। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এ কথার উত্তরে বলেন, 'ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি বিক্রি করে তার চেয়ে উন্নতমানের সম্পত্তি ক্রয় করলে ওয়াক্‌ফকে নষ্ট করা হয় না বা পরিবর্তন করাও হয় না। যেমন ওমর (রাঃ) করেছেন। তাছাড়া একটি ঘোড়া যা জিহাদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে, সেটি বৃদ্ধাবস্থায় বিক্রি করে তার চেয়ে উন্নতমানের ঘোড়া ক্রয় করে জিহাদের জন্য রেখে দেওয়াতে ওয়াক্‌ফের কোন পরিবর্তন হয় না; বরং আরো ভালো হয়' *(দ্রঃ ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উ ফাতাওয়া ৩১/২১৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩১৮)ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য ৩রা বা চল্লিশা দিয়ে কোন খানার আয়োজন করা শরী'আত সম্মত কি?

- ফযলুর রহমান
বালানগর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির নামে ৩রা বা চল্লিশা পালন করার প্রথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈনদের যুগে ছিল না। এটা শরী'আতের মধ্যে নব

আবিষ্কৃত বিষয়, যা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন আমল করল যার প্রতি আমার নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(ছহীহ মুসলিম হা/৪৪৬৮; আবুদাঊদ হা/৪৬০৬; ইবনু মাজাহ হা/১৪, হাদীছ ছহীহ)*। এমনকি এ সমস্ত কাজে সহযোগিতাও করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কল্যাণ ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ২; দ্রঃ আত-তাহরীক ১০ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জুলাই '০৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩১৯)ঃ স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে স্বামী স্ত্রীর মৃতদেহ দেখতে পারবে কি?

- সাইফুল ইসলাম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ মৃত স্বামীকে স্ত্রী ও মৃত স্ত্রীকে স্বামী দেখতে পারবে। এতে শারঈ কোন বাধা নেই। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, 'যদি আমার পূর্বে তুমি মারা যাও, তাহ'লে আমি তোমাকে গোসল দেব, কাফন পরাব, জানাযা পড়াব ও দাফন করব' *(ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫)*। আবুবকর (রাঃ)-কে তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ)-কে তার স্বামী আলী (রাঃ) গোসল দিয়েছিলেন *(বায়হাক্বী ৩/৩৯৭, দারাকুৎনী হা/১৮৩৩, সনদ হাসান দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১২০-২১)*। স্বামী বা স্ত্রী মারা যাওয়ার পর একে অপরকে দেখতে পারবে না, গোসল দিতে পারবে না, তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয় ইত্যাদি কথাগুলি দলীল বিহীন ও মনগড়া কথা মাত্র।

প্রশ্নঃ (৪০/৩২০)ঃ গোরস্থান সংশ্লিষ্ট মসজিদ অর্থাৎ মসজিদের উত্তর-দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বে কবর থাকলে ঐ মসজিদে ছালাত হবে কি?

- রায়হানুল ইসলাম
মির্জাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ ধরনের মসজিদে ছালাত জায়েয হবে না। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইহুদী ও নাছারারা তাদের নবীদের কবর সমূহকে মসজিদ বানিয়ে নেওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের উপরে অভিসম্পাত করেছেন। কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেওয়ার আশংকা যদি না থাকত, তাহ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর কবরকে প্রকাশ করে দেওয়া হ'ত *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৬৭)*। আবু মারছাদ গানাবী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কবরের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় কর না'। মুসলিমের অপর বর্ণনায় আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাঃ) কবর সমূহের মাঝে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন' *(এ হাদীছটি হিব্বান তার ছহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ২৭তম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮)*।

উল্লেখ্য যে, মসজিদের দেওয়াল ব্যতীত মসজিদ এবং কবরস্থানের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে মসজিদকে পৃথক করার জন্য যদি আলাদা কোন প্রাচীর দেওয়া হয় এবং যদি সে মসজিদটি কোন কবরকে কেন্দ্র করে গড়ে না ওঠে, তাহ'লে উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে। যেরূপ খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর তাঁর গৃহের প্রাচীর দ্বারা পৃথক করা ছিল।